দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

ভূস্বর্গের সবুজ গালিচায় রক্তের প্লাবন
--- পৃঃ ২৩

সন্ত্রাসীর ধর্ম আড়াল করতে ব্যস্ত ছদ্ম ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা
--- পৃঃ ১১

৭৭ বর্ষ, ৩৬ সংখ্যা।। ১২ মে, ২০২৫।। ২৮ বৈশাখ, ১৪৩২।। যুগাব্দ - ৫১২৭।। website : www.eswastika.com

বেছে বেছে হিন্দু হত্যা

এখনও বলবেন—

সন্ত্রাসবাদীদের কোনো ধর্ম হয় না ?

CENTURYPLY®

CENTURYPLY® CENTURYLAMINATES® CENTURYVENEERS®

CENTURYPRELAM® CENTURYMDF® CENTURYDOORS™

zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS

STARKE
NEW AGE PANELS

SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR

For any queries, **SMS 'PLY'** to **54646** or call us on **1800-2000-440** or give a missed call on **080-1000-5555**
E-mail: **kolkata@centuryply.com** | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: **www.centuryply.com**

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৭ বর্ষ ৩৬ সংখ্যা, ২৮ বৈশাখ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

১২ মে - ২০২৫, যুগাব্দ - ৫১২৭,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন-এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

শ্রীজগন্নাথের নামে সাংস্কৃতিক প্রকল্প কি 'হিন্দু বিরোধিতা'র প্রাণ কেন্দ্র? : সত্যং বদ ধর্মং চর □ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় □ ৬

দিদির সাম্রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গ ছুটি-ময় □ সুন্দর মৌলিক □ ৭

জলের বদলে রক্ত? : ভারতের অধিকার রয়েছে চুক্তি বাতিল করার □ ব্রহ্মা চেলানি □ ৮

কর্পোরেট ও যুবশক্তির এক সঙ্গে প্রস্থান : সিন্ডিকেট, তুষ্টীকরণ ও প্রশাসনিক ব্যর্থতা □ বিপ্লব বিকাশ □ ৯

৩৭০ ও ৩৫এ ধারা বাতিলের ফলে রূপান্তরিত হতে চলেছে জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখ □ কৌটিল্য □ ১০

সন্ত্রাসীর ধর্ম আড়াল করতে ব্যস্ত ছদ্ম ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা □ ড. রাজলক্ষ্মী বসু □ ১১

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কেন্দ্র বঙ্গভূমি □ ড. জিষ্ণু বসু □ ১৩

সেকুলারিজম ছুঁড়ে ফেলে সন্ত্রাসবাদীদের পরিচয় জেনে নিক ভারতবাসী □ শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী □ ১৫

ভারতবাসী কাশ্মীরে ইসলামি সন্ত্রাসবাদের যোগ্য জবাব চায় □ শিতাংশু গুহ □ ১৮

ভূস্বর্গের সবুজ গালিচায় রক্তের প্লাবন □ মণীন্দ্রনাথ সাহা □ ২৩

পহেলগাঁও হত্যাকাণ্ডের প্রত্যুত্তরে ভারতের সামনে কী কী সামরিক বিকল্প রয়েছে? □ কর্ণেল (ড.) কুণাল ভট্টাচার্য □ ২৫

বিষ্ণুর নবম অবতার : সুগত বুদ্ধ □ নন্দলাল ভট্টাচার্য □ ৩১

স্বদেশপ্রেমী বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথ বসু □ দীপক খাঁ □ ৩৪

শিক্ষা হলো না পাকিস্তানের : দু'খানা টর্পেডোর আঘাতে ডুবে গিয়েছিল পাক সাবমেরিন পিএলএস গাজি □ দুর্গাপদ ঘোষ □ ৩৫

পাকিস্তানি নাগরিকদের বহিষ্কার ও বর্তমান আইন □ ধর্মানন্দ দেব □ ৩৭

একটি মেয়ের কুড়িটি চিঠি—মৃত্যুপুরীর সঞ্জীবনী □ পিন্টু সান্যাল □ ৪৩

জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে কঠোরতম শাস্তি চাই □ রঞ্জন কুমার দে □ ৪৫

ভাতা, ভাণ্ডার না পাবার ব্ল্যাকমেলের ভয় আর মানুষ পাচ্ছেন না □ বিশ্বপ্রিয় দাস □ ৪৯

গল্পকথায় ডাক্তারজী □ সংকলন : বিমলকৃষ্ণ দাস □ ৫০

নিয়মিত বিভাগ :

□ **চিঠিপত্র :১৯-২০** □ **অঙ্গনা : ২১** □ **সুস্বাস্থ্য : ২২** □ **সমাবেশ সমাচার : ২৯-৩০** □ **রঙ্গম : ৩৯** □ **নবাঙ্কুর : ৪০-৪১**

ফঃ ১

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
১৯ মে
২০২৫

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

দাবদাহ থেকে বাঁচতে কী করবেন

দেশজুড়ে শুরু হয়েছে গ্রীষ্মের দাবদাহ। জেলায় জেলায় দেখা দিয়েছে জলসঙ্কট। এই দাবদাহ থেকে বাঁচতে স্কুলের ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে নিজেকে সুস্থ রাখবেন কী করে? বিশেষ করে এই প্রখর রৌদ্রতেজে যারা বিভিন্ন প্রয়োজনে ঘরের বাইরে বেরোবেন তারা কীভাবে সতর্কতা অবলম্বন করবেন— এই বিষয়ে স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় বিভিন্ন দিক্‌নির্দেশ করবেন কয়েকজন চিকিৎসক, পুষ্টিবিদ ও বিশেষজ্ঞ।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :

INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market**

Kolkata-700 006

With Best Compliments from -

A Well Wisher

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

রক্তাক্ত ভূস্বর্গ

ঋষি কশ্যপের সাধনভূমি কাশ্মীর। আদি শঙ্করাচার্যের পদধূলিধন্য। এশিয়া মহাদেশের স্বর্গভূমি। দানবের আক্রমণে সেই ভূস্বর্গ আজ রক্তাক্ত। বহু শতাব্দী ধরেই রক্তাক্ত। অথচ এই কাশ্মীর ছিল সমৃদ্ধিশালী প্রদেশ। মহারাজা মুক্তপীড় ললিতাদিত্য এবং তাঁহার বংশধরদের হস্তেই এই সমৃদ্ধির সূচনা। ১৩৩৯ সালে এই স্বর্গভূমি দানবদের হস্তগত হয়। বৈদেশিক আক্রমণকারী শাহ মীর কাশ্মীর দখল করিলে হিন্দুদিগের ভাগ্যবিপর্যয় শুরু হয়। দলে দলে পির-দরবেশের আগমন ঘটে। হিন্দুদিগকে ধর্মান্তরিত করিয়া জনসংখ্যার ভারসাম্য বিঘ্নিত করা হয়। প্রায় পাঁচশত বৎসর পর মহারাজা রণজিৎ সিংহ বিধর্মী শাসনের অবসান ঘটাইলে উপত্যকায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য কাশ্মীরের, ১৮৪৬ সালে প্রথম ইঙ্গ-শিখযুদ্ধে শিখেরা পরাজিত হইলে পুনরায় হিন্দুদিগের ভাগ্যবিপর্যয় শুরু হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাজিত হইয়া স্বাধীনতা লাভ করিলে জওহরলাল নেহরুর হঠকারিতায় কাশ্মীর দেশীয় রাজ্য হিসাবেই রহিয়া যায়। কিন্তু অচিরেই পাকিস্তানের লোলুপ দৃষ্টিতে কাশ্মীর রক্তাক্ত হয়। অবশেষে কাশ্মীরের মহারাজা কাশ্মীরের ভারতভুক্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করিলেও প্রধানমন্ত্রী নেহরুর অদূরদর্শিতায় কাশ্মীরের একাংশ পাকিস্তান দখল করিয়া রাখে। অদ্যাবধি তাহা তাহাদের দখলেই রহিয়াছে। কাশ্মীরে রক্তক্ষরণও অব্যাহত রহিয়াছে। সেখান হইতেই পাকিস্তান অনবরত ভারতের বিরুদ্ধে ছায়াযুদ্ধ চালাইয়া যাইতেছে। ভারতের সহিত পাকিস্তান একাধিকবার সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হইয়াছে। প্রতিবারই তাহারা ভারতের হস্তে নাকাল হইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও তাহারা ছায়াযুদ্ধের অভিলাষা পরিত্যাগ করে নাই। আসলে, পাকিস্তানের জন্মই হইয়াছে ভারত তথা হিন্দু বিরোধিতার জন্য। দুর্ভাগ্যের যে, দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত বিভাজিত হইবার পরও যাহারা ভারতেই রহিয়া গিয়াছেন তাহাদের অধিকাংশ কিন্তু ভারতকে মাতৃভূমি মনে না করিয়া দার-উল-হারব মনে করিয়াছে। তাহাদের অভিলাষা ভারতভূমিকে দার-উল-ইসলামে পরিণত করা। তাহার জন্য কাশ্মীর হইতে শুরু করিয়া ভারতের সর্বত্র হিন্দুদিগের বিরুদ্ধে তাহারা জেহাদ চালাইয়া যাইতেছে। আরও দুর্ভাগ্যের যে, পাকিস্তানের মদতপুষ্ট জেহাদিরা যেমন ভারতকে রক্তাক্ত করিতেছে, তেমনই ভারতে বসবাসকারী জেহাদিরাও ভারতকে রক্তাক্ত করিয়া চলিয়াছে। পূর্বতন কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনকালে ভারত জেহাদিদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। বিগত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকে জম্মু-কাশ্মীর রাজ্য সরকারের মদতেই কাশ্মীর উপত্যকাকে হিন্দুশূন্য করা হইয়াছে। তৎকালীন মেরুদণ্ডহীন কেন্দ্রীয় সরকার তখন সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কোনোরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করিবার সাহস পর্যন্ত দেখাইতে পারে নাই। নরেন্দ্র মোদী পরিচালিত বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা কাশ্মীর হইতে ৩৭০ ধারা বাতিল করিয়া সন্ত্রাসবাদের মূলে আঘাত করিয়াছে। জম্মু-কাশ্মীরকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত করিবার ফলে কাশ্মীরে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু দেশের সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশে নির্বাচন করিয়া পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা প্রদান করিবার পরই পুনরায় সেখানে জঙ্গি তৎপরতা শুরু হইয়াছে। গত ২২ এপ্রিল পহেলগাঁওয়ে ২৬ জন হিন্দু পর্যটককে হত্যা করিয়াছে ইসলামি জঙ্গিরা।

পহেলগাঁওয়ে শুধুমাত্র হিন্দু পর্যটকদেরই হত্যা করিয়াছে জঙ্গিরা। হিন্দু পরিচয় নিশ্চিত হইয়াই তাহারা এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করিয়াছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী জেহাদিরা শুধুমাত্র হিন্দুদিগকেই হত্যা করিয়াছে। ইহা ইতিহাসসিদ্ধ সত্য। তথাপি এই দেশের সেকু-মাকু ও লিবারালরা প্রচার করিয়াছে যে, সন্ত্রাসবাদীদের নাকি কোনো ধর্ম হয় না। পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলায় জেহাদিরা শুধুমাত্র হিন্দুদিগের উপরই আক্রমণ চালাইয়াছে। মা-বোনেদের সম্ভ্রমহানি করিয়াছে, এমনকী হত্যা পর্যন্ত করিয়াছে। কোনো রাজনৈতিক দল বিচার করে নাই জেহাদিরা। কাশ্মীরে শুধুমাত্র হিন্দু পর্যটকদের উপর আক্রমণ ও হত্যার বিরদ্ধে সমগ্র ভারত তথা বিশ্ব প্রতিবাদে মুখর হইয়াছে। তথাপি এই দেশের সেকু-মাকুরা একই গান গাহিয়া চলিয়াছে— সন্ত্রাসীদের কোনো ধর্ম হয় না। দুর্ভাগ্যের বিষয় হইল, ভারতের অভ্যন্তরেই পাকিস্তানপ্রেমীরা স্বচ্ছন্দে বসিয়া রহিয়াছেন। এই সত্যটি পাকিস্তানেরই সংবাদমাধ্যম প্রকাশ করিয়াছে। তাহারা বলিয়াছে, ‘ভারতের মমতা ব্যানার্জি, কংগ্রেস, সিপিএম, অন্যান্য বামপন্থী দল প্রভৃতি ভারত সরকারের সহিত নাই, তাহারা পাকিস্তানের সহিত রহিয়াছে।’ কাশ্মীরে জঙ্গি আক্রমণের প্রতিবাদে সমগ্র ভারত ক্ষোভে ফুঁসিতেছে। কিন্তু এই পাকিস্তানপ্রেমীদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ কোথায়? ইহাদের দেশ হইতে নির্মূল করিতে না পারিলে ভারতে জঙ্গি ও জেহাদি আক্রমণের অবসান ঘটিবে না। ইহারাই যে জঙ্গি ও জেহাদিদের আসল মদতদাতা তাহা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে।

সুভাষিতম্

দেহীতি বচনদ্বারা দেহস্থা পঞ্চ দেবতাঃ।
মুখান্নির্গত্য গচ্ছন্তি ধীহ্রীশ্রীকান্তিকীর্তয়ঃ।।

‘দাও’– এই শব্দ মুখ থেকে নির্গত হওয়ার সঙ্গেই সঙ্গেই বুদ্ধি, লজ্জা, লক্ষ্মী, কান্তি ও কীর্তি — দেহস্থ এই পঞ্চদেবতা যাচনাকারীর দেহ ছেড়ে চলে যায়।

শ্রীজগন্নাথের নামে সাংস্কৃতিক প্রকল্প কি ‘হিন্দু বিরোধিতা’র প্রাণকেন্দ্র?

সত্যং বদ ধর্মং চর

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মূর্তি ভেঙেছিল দেশবিরোধী, উঞ্ছ নকশালরা। মূর্খের দল জানত না তাদের গুরুর গুরু সান-ইয়াৎ-সেন ১৯২৪ সালে বিশ্বকবিকে সংবর্ধনা দিয়েছিল। তৃণমূল আর নকশালরা সমান নৈরাজ্যবাদী। অর্বাচীনের মতো অসম্ভবকে সম্ভব করতে দীঘা পর্যটন কেন্দ্রে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের আদলে তৈরি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র বানিয়ে তা ‘মন্দির’ বলে চালানোর চেষ্টা করছে তৃণমূল। এটা হিন্দু ভোট বগলদাবার ফন্দি। অনর্গল অনৃতভাষণ তৃণমূলের মজ্জাগত। অষ্টাদশ শিষ্টাচারে ধর্মের জন্য বাঁচা এবং সমাজের জন্য বাঁচা তৃণমূলের ক্ষেত্রে চোরার কাছে ধর্মের কাহিনি। শুনেছি পুরীর শ্রীশ্রীজগন্নাথের নামে সংকল্প করেই তৈরি হয়েছে দীঘার জগন্নাথ প্রকল্প। তাতে ১৯৫২ ও ১৯৫৪ সালের পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের ‘রেকর্ড অফ রাইটস্’ নিয়মনীতি অনুসরণ করা হয়নি। ১৯৫৫ সালের পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশের যে নিয়ম রয়েছে তাও লঙ্ঘন করা হয়েছে। ১৯৬৬ সালে আমেরিকায় স্থাপিত হয় ‘ইসকন’। প্রকল্পটি পরিচালনার দায়িত্ব তাদের দেওয়া হয়েছে। ইসকন গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের আদর্শে তৈরি হলেও ওই সংস্থায় বহু সদস্য রয়েছেন যারা জন্মসূত্রে অহিন্দু। তাই পুরীর শ্রীমন্দিরে তাদের প্রবেশ নিষেধ। সুপ্রিম কোর্ট বহুবার একাধিক রায়দানের মাধ্যমে পুরীর শ্রীমন্দিরের এই অধিকার সুনিশ্চিত করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শ্রীমন্দির বিষয়ক যাবতীয় বিধি রচনার ক্ষেত্রে ‘মাদলা পঞ্জী’ বা ‘শ্রীপুরুষোত্তম চন্দ্রিকা’ অনুসৃত হয়েছে।

বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা সনাতন ভারতীয় সংস্কৃতির অঙ্গ। তৃণমূলের পক্ষে তা দিবাস্বপ্ন। হিন্দু মন্দির আর দেবালয় চলে আচার-উপাচারকে কেন্দ্র করে। তা বেদের কর্মকাণ্ডের অংশ। তার অন্য দিক জ্ঞানকাণ্ড। মমতার দলের সে কাণ্ডজ্ঞান নেই। আদি শঙ্কর প্রতিষ্ঠিত ‘চার ধাম’-এর বিষয়ে মমতার কোনো ধ্যানধারণা নেই। এটা সত্য যে ওই দলে কিছু মানুষ ছিলেন যারা বিষয়টি সম্পর্কে অবগত। তাদের কুলোর বাতাস দিয়ে তাড়ানো হয়েছে। চৌর্যবৃত্তি ও মিথ্যাচারণ তৃণমূলের ভাবনার অংশ। ফলে ঈশ্বর প্রতিষ্ঠাও তাদের কাছে চৌর্য ভাবনা আর মিথ্যার বেসাতি। আদি শঙ্করাচার্য দশনামী, বৈদান্তিক সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি চার ধাম স্থাপন করেন, যার মধ্যে রয়েছে শ্রীক্ষেত্র পুরী। চার ধামের জন্য চার মহাবাক্য সমন্বয়ে সৃষ্টি হয় ভারতীয় দর্শনের ভিত্তি— অহং ব্রহ্মস্মি, প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম (পুরী), অয়মাত্মা ব্রহ্ম ও তৎ ত্বম্ অসি বা তত্ত্বমসি। এই চার বাক্যের মূল তত্ত্ব এবং চার ধামের ঐতিহ্য ও সংস্কারকে লঙ্ঘন করার যেকোনো বিষয় হিন্দু মতে অসিদ্ধ ও হিন্দুবিরোধী। সেদিক থেকে মমতার এই সাংস্কৃতিক প্রকল্প অবশ্যই হিন্দুবিরোধী। মক্কা-মদিনার বাইরে কোনো স্থানকে পুণ্যভূমি বলে মানে না মুসলমানরা। আদি শঙ্কর প্রতিষ্ঠিত চার ধামের বাইরে যেকোনো ধাম অসিদ্ধ, অপবিত্র ও অহিন্দু। তবে এটা বেদনার যে হিন্দুত্বের ভাবনায় জারিত হয়েও কিছু মানুষ মশা-মাছির মতো মমতার খাতায় নাম তুলতে ওই পর্যটন কেন্দ্রের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছেন। আমার মতে তারা হিন্দু ঐক্য বিরোধী।

এ রাজ্যে এখনও কিছু হিন্দু রয়েছেন যারা নিজেরাই নিজেদের শত্রু। তারা মমতার সঙ্গে আপোশ করে হিন্দু ঐক্য ধ্বংস করেন, আবার সব ধরনের হিন্দুবিরোধী শক্তিকে সংহত করতে অসংযত ব্যবহার করেন।

ঠাট্টা করে অনেকে বলছেন দীঘাতে ‘চোর ধাম’ তৈরি হয়েছে। মমতা হিন্দু স্বার্থে কোনো কাজ করতে পারেন বা ভাবতে পারেন এটা মানা মুশকিল। মমতাকে সরাসরি হিন্দুবিরোধী না বললেও এটা স্বচ্ছন্দে বলা চলে যে ধর্মনিরপেক্ষতার আড়ালে তিনি কংগ্রেস ও সিপিএমের থেকেও বেশি মুসলমান তোষণ করেন। তার এই বিভাজনের রাজনীতি রাজ্যে ধর্মীয় বিভাজনের মূল কারণ। অত্যধিক মুসলমান তোষণই সহনশীল হিন্দু জাতিকেও নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে নামতে বাধ্য করেছে। মোথাবাড়ি ও মুর্শিদাবাদ হলো জেহাদিদের পিছনে রাজ্য সরকারের নির্লজ্জভাবে মদতের সাম্প্রতিক উদাহরণ যা সমগ্র হিন্দুসমাজকে নাড়িয়ে দিয়েছে। পহেলগাঁওয়ে পাকিস্তান ও স্থানীয় কাশ্মীরি মুসলমান জঙ্গিদের মদতে হিন্দু হত্যার ঘটনা মমতার এই তোষণ নীতিকে আরও নগ্ন করেছে। কট্টরবাদী মুসলমান ভোট মমতার সঙ্গে থাকলেও ২০২৬-এর রাজ্য বিধানসভা ভোট নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বেশ অস্বস্তিতে রয়েছেন। মমতা হিন্দু ভোট ভাগাভাগিতে জেতেন। তাই ঐক্যবদ্ধ হিন্দু ভোটের পালটা হিসেবে বাম-কংগ্রেসের মুসলমান ভোটে ভাগ বসাতে চান।

ধর্মনিরপেক্ষ দেশে বিপুল পরিমাণ সরকারি অর্থ খরচ করে দীঘায় হাঁসজারু মন্দির গড়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। খরচের অঙ্ক— ২৫০ কোটি টাকা। কিন্তু তাতেও কি শেষ রক্ষা হবে? এ রাজ্যে এখনও কিছু হিন্দু রয়েছেন যারা নিজেরাই নিজেদের শত্রু। তারা মমতার সঙ্গে আপোশ করে হিন্দু ঐক্য ধ্বংস করেন, আবার সব ধরনের হিন্দুবিরোধী শক্তিকে সংহত করতে অসংযত ব্যবহার করেন। এরাও তৃণমূলের মতোই চোরা। প্রয়োজনে এই বর্ণচোরাদেরকেও এবার জোর করে ধর্মের কাহিনি শোনাতে হবে। যারা হিন্দু ঐক্য ভাঙতে চায়, সাচ্চা হিন্দুদের তাদেরকে ভাঙতে হবে। সে যেই হন।

(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)

দিদির সাম্রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গ ছুটি-ময়

ছুটিদাত্রীষু দিদি,

আপনার যাঁরা বদনাম করেন তাঁরাও কিন্তু এই একটি ব্যাপারে কোনো কথা বলতে পারেন না। ছুটি দেওয়ার বিষয়ে আপনি বামফ্রন্টের মতো কৃপণ নন। সেই সময়ে রাজ্যে সারা বছরে মেরেকেটে ৩০টা ছুটি পাওয়া যেত। এখন সেটা দ্বিগুণ হয়েছে। তবে স্কুল-কলেজে এমনিতেই বেশি ছুটি হয়। কারণ, অন্য কোনো অফিসে তো গরমের ছুটি পড়ে না। কিন্তু স্কুলে পড়ে। আর সেটাও আলাদা করে প্রতি বছরই আপনি বাড়িয়ে দেন। ছেলে-মেয়েদের যে কী আনন্দ দিদি, তা আর বলার নয়। তবে সেটা মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত পরিবারে। যদিও তারা বেশিরভাগই বেসরকারি স্কুলে পড়ে। গরিব ঘরের ছেলে- মেয়েরা কত কষ্টই পায়। আপনার রাজ্যে বাবাদের রোজগার কম বা নেই। মায়েদের হাতে মাসে হাজার টাকা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। ফলে স্কুলে গেলেই তো দুপুরের খাবারটা নিশ্চিত। মিড ডে মিল তাদের কাছে বড়ো ভরসা। কিন্তু ছুটি মানে দুপুরের খাবারেও ছুটি।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে রাজ্যের সরকারি ও সরকারপোষিত স্কুলগুলিতে গরমের ছুটির অবস্থা এমনই। এই বছর ৩০ এপ্রিল থেকে শুরু হয়েছে ছুটি। যদিও সরকারি স্কুলের ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ছুটি পড়ার কথা ছিল ১২ মে। স্কুল খোলার কথা ছিল ২৩ মে। সেই সময়সীমা তো শুধুই কাগজে লেখা। ছুটি শেষ হবে যবে আপনি এই সাম্রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করবেন। এটাই তো এ রাজ্যে নিয়ম। বছর বছর সেটাই তো হয়ে আসছে।

গত ৩ এপ্রিল আপনি ঘোষণা করেছিলেন— তীব্র গরমের জন্য ৩০ এপ্রিল থেকে স্কুলে গরমের ছুটি শুরু হবে। শেষ কবে? শিক্ষা দপ্তর ‘আবহাওয়ার গতিপ্রকৃতি’ দেখে ঠিক করবে। কিন্তু, এখনো পর্যন্ত সে বিষয়ে তারা নির্দেশিকা জারি করেনি। নিয়মের এগারো-বারো দিনের ছুটি শেষ পর্যন্ত এক মাসের বেশি সময় ধরেই চলবে বলেই মনে হয়।

অনেকে বলেন, এমন ইচ্ছা-ছুটি কোনো সভ্য দেশের শিক্ষা-চিত্র হতে পারে না। এটা কিন্তু অনেকে বলেন। আমি মোটেও বলি না। মনে করলেও বলি না, কারণ এটা আপনার সিদ্ধান্ত যা কখনো ভুল হতে পারে না।

তবে বলা হয় যে, শিক্ষাবর্ষের হিসেবে ছুটির ক্যালেন্ডারটিও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সেই হিসেবে পরীক্ষাসূচি ঠিক হয়। তার জন্য নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাঠ্যক্রম শেষ করতে হয়। কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে নিশ্চয়ই তার পরিবর্তন হতে পারে, কিন্তু পরিবর্তনটাই নিয়ম হয়ে গেলে যে মুশকিল। শিক্ষকদের একাংশ মনে করেন, এগিয়ে-আনা ছুটিতে পাঠ্যক্রম শেষ করা দুরূহ। লক্ষণীয়, এই বছর এখনো গরম অসহনীয় হয়ে ওঠেনি। ফলে, আরও কিছুদিন অনায়াসে স্কুল খোলা রাখা যেত। কিন্তু এপ্রিলের গোড়াতেই মুখ্যমন্ত্রী ছুটি ঘোষণা করে দেওয়ায় সে কাজ করা যায়নি। গ্রীষ্ম অসহনীয় হয়ে উঠলেও কি বিকল্প উপায় ছিল না? কিছুদিন ছুটি দিয়ে ফের স্কুল খোলা যেত, স্কুলের সময় এগিয়ে আনা যেত। অথচ, কিছুই ভাবা হলো না। আবার উত্তরবঙ্গে গরম কিছুটা দেরিতে বাড়ে। ফলে ছুটিটা জেলা অনুযায়ী ভাবা যেতেই পারে।

উষ্ণায়নের কারণে দিন দিন গ্রীষ্ম প্রখরতর হচ্ছে। সেক্ষেত্রে পুরনো সময়সূচি আঁকড়ে থাকলে চলবে না। গ্রীষ্মের ছুটি যদি একান্তই দীর্ঘায়িত করতে হয়, তবে পুজোর ছুটি-সহ অন্য অনাবশ্যক ছুটি কমিয়ে ভারসাম্য রাখা প্রয়োজন।

উষ্ণায়নের কারণে দিন দিন গ্রীষ্ম প্রখরতর হচ্ছে। সেক্ষেত্রে পুরনো সময়সূচি আঁকড়ে থাকলে চলবে না। গ্রীষ্মের ছুটি যদি একান্তই দীর্ঘায়িত করতে হয়, তবে পুজোর ছুটি-সহ অন্য অনাবশ্যক ছুটি কমিয়ে ভারসাম্য রাখা প্রয়োজন।

দিদি, সাহস করে অন্য একটি কথা বলি। স্কুল ছুটি মানে গরিব ঘরের ছেলেরা উপার্জনের কাজে হাত লাগায়, মেয়েরা গৃহস্থালির কাজে। ফলে বাড়িতে লেখাপড়া মোটেও হয় না। সেই সঙ্গে এক বেলা ভরপেট গরম খাবারের আশ্বাসটুকুও নেই। ফলে এতটা ছুটিবিলাসী না হয়ে কিছু কি করা যায় না? ও দিদি, করা কি যায় না? □

অতিথি কলম

ব্রহ্মা চেলানি

জলের বদলে রক্ত?

ভারতের অধিকার রয়েছে চুক্তি বাতিল করার

১৯৬০ সালে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সিন্ধু জলচুক্তি হয়েছিল। সেসময়ে এই চুক্তির সঙ্গে জড়িয়েছিল ভারতের বদান্যতা। ভারত নদীপ্রবাহের উপরিভাগে থাকা দেশ হওয়া সত্ত্বেও জলবণ্টন চুক্তি অনুযায়ী ৮০ শতাংশ জল পাকিস্তানকে দিয়ে এসেছে।

সিন্ধু জলচুক্তি করা হয়েছিল এই আশায় যে, দুই প্রতিবেশী দেশ এই উপমহাদেশে একসঙ্গে সহযোগিতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে কাজ করবে। পাকিস্তান অবশ্য এই পথে না হেঁটে ভারতের এই বদান্যতাকে দুর্বলতা ভেবে কৃতজ্ঞতার বদলে উপহার পাঠিয়েছে জঙ্গি, গ্রেনেড ও গোলাবারুদ।

২০০১ সালে ভারতের সংসদ ভবনে ভয়াবহ আক্রমণ থেকে শুরু করে ২০০৮ সালের ঘৃণ্য ও ভয়ংকর মুম্বই হামলা এবং ২০১৬-র উরি হামলার পর ২০১৯ সালে পুলওয়ামা হামলা—সবই ছিল ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের সুপরিকল্পিত ছায়াযুদ্ধ। এভাবে একের পর এক ভারতের ওপর হামলা সত্ত্বেও ভারত তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে পাকিস্তানকে জল সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রেখেছিল। প্রতিদান হিসেবে পাকিস্তান কিন্তু একনাগাড়ে ভারতের রক্ত ঝরিয়ে এসেছে।

কিন্তু গত ২২ এপ্রিল কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে নিরপরাধ হিন্দু পর্যটকদের ধর্ম জিজ্ঞাসা করে যেভাবে হত্যালীলা চলিয়েছে পাকিস্তানের মদতপুষ্ট ইসলামি জঙ্গিরা, তাতে স্বাভাবিকভাবে মোদী সরকার যেসব চুক্তি বাতিল করেছে তার মধ্যে সিন্ধুনদের জলবণ্টন চুক্তি প্রধান ও অন্যতম।

এই চুক্তি বাতিল একটি ছোটো ঘটনা নয়। বরং ভারত সরকারের তার দেশের নাগরিকদের সুরক্ষা দিতে এবং দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে এক সঠিক পদক্ষেপ। এই বিষয়ে আন্তর্জাতিক আইন খুব পরিষ্কার—'যখন কোনো সন্ধি বা চুক্তির প্রাথমিক শর্ত উল্লঙ্ঘন হয় অথবা চুক্তির অপরপক্ষ শর্ত না মেনে তা লঙ্ঘন করে তবে অপর পক্ষের অধিকার রয়েছে সেই চুক্তি রদ করা অথবা চুক্তি থেকে সরে যাওয়া।

যখন কোনো দেশ বিনা প্ররোচনায় অন্য দেশের সাধারণ মানুষের ওপর হামলা চালায়, তখন হামলাকারী শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের যে শর্ত বা চুক্তি অন্য দেশের সঙ্গে রয়েছে, তার ওপর স্বাভাবিকভাবেই অধিকার হারায়। সিন্ধু জলচুক্তি কোনো আলাদা প্রকারের চুক্তি নয়, বরং এই চুক্তির প্রাথমিক শর্তই হলো পারস্পরিক বোঝাপড়া বা বিশ্বাসের ওপর দাঁড়িয়ে। সেই বিশ্বাসের ওপর যখন অপরপক্ষ কুঠারাঘাত করে, তখন চুক্তি বাতিল হয়। এছাড়াও, বিশ্ব এই চুক্তি বাতিলের বিষয়ে ওয়াকিবহাল নয় আদপে এমনটা নয়। আমেরিকা ২০০২ সালে একতরফাভাবে ক্ষেপণাস্ত্র বিরোধী চুক্তি বাতিল করেছিল এবং পরমাণু চুক্তি থেকে বেরিয়ে এসেছে আভ্যন্তরীণ সুরক্ষার অজুহাতে। যে কোনো সার্বভৌম দেশের অধিকার অছে তার সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার এবং অন্য দেশের আগ্রাসন থেকে নিজেকে রক্ষা করার। ভারত তার ব্যতিক্রম নয়।

সিন্ধু জলচুক্তির মধ্যে আবদ্ধ থাকা অবস্থায়ও পাকিস্তান বিশ্বাঘাতকতা করেছে ক্রমাগত। পাকিস্তান চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন করে ভারতীয় পরিকাঠামো প্রকল্পের প্রভূত ক্ষতিসাধন করেছে এবং ভারতকে তার প্রাপ্য জল থেকে বঞ্চিত করেছে। পাকিস্তান অতি নগণ্য কারিগরি ইস্যু তুলেছে আন্তর্জাইতক সালিশি সভায়। ভারত সেই বিবাদ থেকে এখনো মুক্ত হতে পারেনি।

ভারত এখন পাকিস্তানকে বুঝিয়ে দিয়েছে, পাকিস্তান যেন ভারতের সীমাহীন ধৈর্যকে দুর্বলতা না ভেবে বসে। ভিয়েনা কনভেনশানের ৬৯ নম্বর সন্ধিচুক্তির শর্তে বলা হয়েছে যে, কোনো দেশ যেকোনো চুক্তির শর্ত উল্লঙ্ঘন করলে অপর দেশ সেই দ্বিপাক্ষিক চুক্তি থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে পারে। যাইহোক, ভারত এখন পরিস্থিতির পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে এবং বাস্তব পরিস্থিতির বিচারে সিন্ধু জলচুক্তি একেবারে খারিজ না করে চুক্তি রূপায়ণ আপাতত স্থগিত রেখেছে। ভারত এখনো এই মুলতুবি বিষয়টিকে সতর্কবার্তা হিসেবে দেখছে যাতে পাকিস্তান নিজের আচরণ বদল করে। দুই দেশের সম্পর্কের যে সেতু এতকিছু ঘটার পরেও টিকে আছে, ভারত তা এখনই ভেঙে দিতে চায় না। এতকিছু সত্ত্বেও ভারত চাইছে না অববাহিকায় জল প্রবাহকে বিঘ্নিত করতে। ভারত এখনো মনে করে দেশের বৈরিতা পাক সরকারের সঙ্গে, পাকিস্তানের সাধারণ মানষের সঙ্গে নয়। ভারত বলেছে, তাদের কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ মানবতা বিরোধী নয়। বরং উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে জলসরবরাহ মুলতুবি রাখার কথা চীনের কাছে সতর্কবার্তা পৌঁছে দেবার জন্য। কারণ চীন ইতিমধ্যেই নদী অববাহিকায় অবস্থিত দেশগুলোকে জল না দেবার হুঁশিয়ারি দিয়েছে। তার ওপর চীন ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকায় বাঁধ তৈরি করেছে যাতে ব্রহ্মপুত্র দিয়ে প্রবাহিত জলসরবরাহ কমে যায়।

পাকিস্তানের আর্থিক দৈন্য নিত্যসঙ্গী। সামরিক শক্তিতে ভারতের ধারেকাছেও নেই। ভারত বহুবার পকিস্তানেকে ভারত-বৈরিতা ছাড়তে বলেছে। তবু পাকিস্তান ভারত-বৈরিতা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা মাঝে মধ্যেই জেহাদের ডাক দেয়। পরমাণু যুদ্ধের হুমকি দেয়। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করেন, যুদ্ধের মাধ্যমে দুইদেশের মধ্যে যে ঘৃণার মনোভাব রয়েছে তার বিবর্তন হতে পারে। অবাক হবার মতো বিষয় যে, সম্প্রতি পহেলগাঁওয়ে নারকীয় হত্যাকণ্ডের পর পাকিস্তানের ঘাড়ের ওপর ভারতের রোষনিশ্বাস পড়ছে, তারপরেও তারা পরমাণু যুদ্ধের কথা বলে চলেছে।

এতকিছুর পরেও ভারত শর্তসাপেক্ষে জলবণ্টনে বিকল্প ব্যবস্থার কথা পাকিস্তানকে জানাতে পারে, কিন্তু সিন্ধু জলবণ্টন চুক্তি সর্বতোভাবে বিফল হয়েছে। ভারতের দিক থেকে সদিচ্ছা থাকলেও পাকিস্তান আছে পাকিস্তানেই। এখনো সে সন্ত্রাসবাদের কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে। ভারতের ধৈর্য ঐতিহাসিক। ভারতবাসী সেই ধৈর্যের অবসান চায়।

(লেখক নয়া দিল্লির সেন্টার ফর পলিসি রিসার্চের অধ্যাপক)

কর্পোরেট ও যুবশক্তির একসঙ্গে প্রস্থান : সিন্ডিকেট, তুষ্টীকরণ ও প্রশাসনিক ব্যর্থতা

বিপ্লব বিকাশ

এক সময় যেখান থেকে আলো ছড়াতো, আজ সেখানেই অন্ধকার ঘনিয়েছে। যে কলকাতা ছিল শিল্প, বাণিজ্য আর জ্ঞানচর্চার প্রাণকেন্দ্র, আজ সেখান থেকে একের পর এক সংস্থা প্রস্থান করছে। এটি কি কেবল অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান, নাকি একটি গভীরতর সামাজিক-রাজনৈতিক সংকেত? গত পাঁচবছরে পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রায় ২,২২৭টি কোম্পানি তাদের রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর করেছে। এর মধ্যে অন্তত ৩৯টি ছিল তালিকাভুক্ত কোম্পানি। শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর এই পালিয়ে যাওয়ার পেছনে প্রধান কারণ হিসেবে উঠে এসেছে প্রশাসনিক বাধা, খরচ কমানো ও কার্যকর ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন দিক। প্রশ্ন ওঠে, তারা কাকে ছেড়ে যাচ্ছে? শুধুই রাজ্যকে, নাকি গোটা এক মডেলকে, যার নাম 'বেঙ্গল মডেল'? এটি আর নিছক পলায়ন নয়, এটি এক নীরব প্রতিবাদ।

বেঙ্গল মডেল শুধুই একটি তাত্ত্বিক ধারণা নয়; এটি একটি বাস্তব রাজনৈতিক-প্রশাসনিক কাঠামো, যা কয়েক দশকের রাজনীতীকরণ, দুর্নীতি, প্রশাসনিক ব্যর্থতা এবং সামাজিক মেরুকরণের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। এর মূল স্তম্ভ চারটি— প্রথম, 'সিন্ডিকেট রাজ', যেখানে নির্মাণ থেকে পণ্য সরবরাহ পর্যন্ত সব কিছুতেই স্থানীয় রাজনৈতিক কার্টেল প্রভাব ফেলে, আর ব্যবসা চালাতে গেলে তাদের 'আনুষ্ঠানিক ফি' দিতে হয়। দ্বিতীয়, 'রাজনৈতিক তুষ্টীকরণ', যেখানে ভোটব্যাংক ধরে রাখতে গোষ্ঠীগত স্বার্থকে প্রশাসনিক নিরপেক্ষতার ওপরে স্থান দেওয়া হয়। তৃতীয়, 'দুর্নীতি ও আমলাতান্ত্রিক বিলম্ব', যেখানে লাইসেন্স, অনুমোদন বা পরিদর্শনের জন্য ঘুষ বা রাজনৈতিক প্রভাব ছাড়া কাজ হয় না। চতুর্থ, 'আইনশৃঙ্খলার অবক্ষয়', এই দিকটিকেই দেখলে মনে হয় ভগবান কবে যে রাজ্যে আইনের শাসন দেবেন! শাসনের আইন আর নেওয়া যাচ্ছে না। বিনিয়োগের সবচেয়ে বড়ো প্রতিবন্ধকতা হিসেবে আইনশৃঙ্খলাকে চিহ্নিত করা হবে। সেটার অবস্থা কী আমরা সবাই জানি। এইসব কারণে শিল্পের শিরোনামে যে প্রদেশ ছিল উল্লেখযোগ্য স্থানে, ১৯৭০ সালের পর থেকে তার ক্রমাগত অবনমন হয়ে বর্তমানে অষ্টম স্থানে পৌঁছেছে। মহারাষ্ট্র বর্তমানে শীর্ষে, যেখানে মুম্বই হয়েছে দেশের কর্পোরেট রাজধানী। এককালে যে কলকাতা ছিল ভারতের অর্থনৈতিক হৃদয়। ব্যবসায়ীর সংখ্যা কমছে আর এজেন্ট, ডেলিভারি বয়েজের সংখ্যা বাড়ছে।

একই সঙ্গে ঘটে চলেছে 'শিক্ষিত বাঙ্গালি এক্সোডাস', অর্থাৎ উচ্চশিক্ষিত ও দক্ষ বাঙ্গালি যুবসমাজের দেশ-বিদেশে স্থানান্তর। চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার, অ্যাকাউন্ট্যান্ট, শিক্ষক— এই পেশাগুলোর মানুষজন আজ আর পশ্চিমবঙ্গে থাকতে চান না। কারণ, তাঁরা কাজের সুযোগ, কৃতিত্বের স্বীকৃতি, সম্মান ও নিরাপত্তা নিয়ে অনিশ্চয়তায়। সব কিছুতেই রাজনীতির রং মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেরকম বাচ্চাদের পোলিও ড্রপ দেওয়া হয়।

আরেকটি অবহেলিত বাস্তবতা হলো স্থানীয় ব্যবসা ও পরিষেবা ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীর দুধেল গাইদের দখলদারিত্ব। ভেবে দেখুন, মটন বা ফল কার কাছ থেকে নিতে হচ্ছে? বিশেষ করে মুর্শিদাবাদ ও মালদহ জেলাগুলিতে বাংলাদেশি মুসলমানদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। তারা মুদি দোকান, খুচরো বিক্রয়, ট্রান্সপোর্ট ও দুধ-জল-সবজি সরবরাহের মতো জীবিকা দখল করছে। এই প্রবণতা শুধু কাজের ক্ষেত্রেই নয়, স্থানীয় সংস্কৃতি ও নিরাপত্তার প্রশ্নেও উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যদি এই দুই ধারা— কর্পোরেট এক্সোডাস ও বাঙ্গালি জনসংখ্যার প্রস্থান চলতে থাকে, তবে পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ হবে এক বিষণ্ন দুর্যোগ। একদিকে নতুন শিল্প আসছে না, অন্যদিকে প্রতিভা ও দক্ষতা বাইরে চলে যাচ্ছে। আর বাকি থাকবে এমন একটি সমাজ, যেখানে জীবিকার বড়ো অংশ থাকবে অনিয়ন্ত্রিত, অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের হাতে। এখনই সময় নতুন প্রজন্মের ঘুম থেকে জাগার। পশ্চিমবঙ্গকে আবার অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী করতে হলে একদিকে রাজনৈতিক সদিচ্ছা দরকার, অন্যদিকে বাঙ্গালি যুবসমাজের প্রত্যাবর্তন ও নেতৃত্ব। না হলে আগামী দিনের পশ্চিমবঙ্গ হবে এমন এক রাজ্য, যেটা থাকবে শুধু ভারতের মানচিত্রে, কিন্তু ভবিষ্যতের সম্ভাবনার মানচিত্রে হারিয়ে যাবে। বেঙ্গল মডেলে রাজনৈতিক তোষামোদ তো হচ্ছেই আর্থিক ক্ষেত্রেও দুধেল গাইদের রাজ চলছে।

এই চক্রান্তে সব থেকে বেশি ফেঁসে যাচ্ছেন সেই গ্রামের মায়েরা যেখানে হিন্দু পুরুষ সংখ্যা অত্যল্প এবং বালক ও বৃদ্ধরা থাকে। যুবকরা কাজের জন্য পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে অন্ধ্র, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, কেরালা প্রভৃতি প্রদেশ চলে যাচ্ছেন আর প্রতিভাশালী যুবকেরা অন্য দেশ নাহলে অন্য প্রদেশের বাসিন্দা হয়ে যাচ্ছেন। পশ্চিমবঙ্গে আবার অর্থনৈতিক প্রাণশক্তি ফিরিয়ে আনতে হলে সিন্ডিকেট-রাজ ভেঙে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রশাসনে নীতিগত নিরপেক্ষতা আনতে হবে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রযুক্তিনির্ভর স্বচ্ছ প্রক্রিয়া গড়ে তুলতে হবে এবং শিল্পাঞ্চলে আইনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। কর্পোরেটদের জন্য কলকাতা ও অন্যান্য শহরে গুজরাট বা বেঙ্গালুরুর মতো ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ তৈরি না হলে তারা অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হবে। এই 'বেঙ্গল মডেল' একটি সতর্ক সংকেত প্রতিটি কোম্পানির প্রস্থান মানে শুধু আর্থিক ক্ষতি নয়, বরং সম্ভাবনা ও স্বপ্নের অপমৃত্যু। □

৩৭০ ও ৩৫এ ধারা বাতিলের ফলে রূপান্তরিত হতে চলেছে জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখ

১৯৯১ সাল থেকে ভারতীয় অর্থব্যবস্থা বিশ্বায়ন ও মুক্তবাজার অর্থনীতির দিকে গিয়ে সাফল্য পেলেও, বাদ থেকে যায় কিছু রাজ্য, যার মধ্যে অন্যতম 'জম্মু ও কাশ্মীর'। বিশেষ করে এই রাজ্যের সংখ্যালঘু হিন্দুরা। প্রথমেই আসি কাশ্মীরি পণ্ডিতদের কথায়। ভারতীয় সংবিধানের ৩৭০ ও ৩৫এ ধারা বিলোপের সঙ্গে এই রাজ্যের আসন পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে নতুন আঙ্গিকে জম্মু- কাশ্মীরবাসীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ঘটানো হয়েছে, যাতে ভবিষ্যতে এঁদের ভাগ্য এরাই নির্ধারণে সক্ষম হয়। এঁদের ভাষা মূলত কাশ্মীরি ও ডোগরী। কিন্তু এঁদের পড়াশোনা করতে হতো হিন্দি ও উর্দুতে। এঁদের মাতৃভাষায় কোনো সিনেমা বা নাটক হতো না। পশ্চাদগামী আইন দুটির বিলোপ তাঁদের লুপ্তপ্রায় সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারে সহায়ক হবে। বিধানসভাতেও স্থানীয়দের প্রতিনিধিত্ব বাড়বে।

দ্বিতীয়ত, বাল্মীকি সমাজ। পঞ্চাশের দশকে ময়লা পরিষ্কারের জন্য এঁদের উপত্যকায় নিয়ে এসেছিল কাশ্মীরি শাসকরা। কিন্তু নাগরিকত্ব দেয়নি বা নাগরিকত্ব পেতে সাহায্য করেনি। ভারতীয় সংবিধান প্রদত্ত সংরক্ষণের সুবিধা থেকে এরা বঞ্চিত। সরকারি চাকরি, জমির মালিকানা কিছুই পায়নি এই প্রতারিত সমাজ। এই প্রান্তিক মানুষদের পরবর্তী প্রজন্ম এখনও সব রকমের সরকারি সুযোগ থেকে বঞ্চিত। নিজেদের দেশে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হয়ে বসবাস করছেন তাঁরা। বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা মুসলমানদের ভারতীয় নাগরিকত্ব দেওয়া নিয়ে সোচ্চার বুদ্ধিজীবীরা এঁদের প্রাপ্য অধিকার সম্পর্কে আশ্চর্যজনকভাবে সাত দশক নির্বাক ছিল। এতদিনে বিচার পেলেন সমাজের এই প্রান্তিক মানুষরা। ৩৭০ ধারা বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা পেলেন ভারতীয় সংবিধান প্রদত্ত সব রকম অধিকার।

তৃতীয়ত, লাদাখের বৌদ্ধ মতাবলম্বী মানুষ। 'গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধতা' বিষয়ে যদি কোনো প্রবন্ধ লিখতে দেওয়া হয়, তবে ৭২ বছর ধর্মীয় সংখ্যালঘু হওয়ার যে দাম এরা দিয়েছে তা গণতান্ত্রিক সীমাবদ্ধতার উৎকৃষ্টতম উদাহরণ হিসেবে গণ্য হতে পারে। এঁদের মাতৃভাষা লাদাখি, তিব্বতি ও বাল্টি। কিন্তু এঁদের উপর উর্দু চাপিয়ে দেওয়া হতো। লাদাখ ও কাশ্মীর উপত্যকার পরিবেশ আলাদা হলেও সরকারি আবাসন হিসেবে এদের কাশ্মীরের মতো বাড়ি বানিয়ে দেওয়া হতো। এখানে কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং বা মেডিক্যাল শিক্ষার প্রতিষ্ঠান, কোনো ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট বা কোনো বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না। রাজ্য সরকারি বাজেটের মাত্র ৫ শতাংশ এই অঞ্চলের ভাগ্যে জুটতো। শিল্প ও পরিবহণ পরিকাঠামো তো ছিল খুবই খারাপ। জম্মু-কাশ্মীরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে কিছুটা বাঁচলে তারপর এরা পেত। ফলে অর্থনৈতিকভাবে সবচেয়ে পিছিয়ে ছিল এই অংশ। বাল্মীকিদের মতো এরাও সংরক্ষণের সুবিধা পেতেন না। পড়াশোনার সুযোগ ছিল না বলে পুলিশ কনস্টেবলের চাকরির চেষ্টার বেশি এগোনো যেত না। অথচ মেধা প্রচুর।

বর্তমানে লাদাখ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল। সংবিধানের এই দুটি ধারার বিলোপের দরুন লাদাখে বসবাসকারী বৌদ্ধদের জীবনেও বাল্মীকিদের মতো নতুন সূর্যোদয় হয়েছে।

এছাড়া দুটি ভাগ হওয়া রাজ্যের সরকারি কর্মী, শিক্ষক ও ডাক্তাররা পেয়েছেন কেন্দ্রীয় হারে বেতন ও অবসরকালীন ভাতার নিশ্চয়তা। সারা ভারতের মতো অর্থব্যবস্থার অধিকারী হতে চলেছে জম্মু-কাশ্মীর। এখানকার ল্যান্ড মার্কেট, লেবার মার্কেট ও ক্যাপিটাল মার্কেট স্বাভাবিক নিয়মেই বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতির অংশ হবে এবং গুণোত্তর প্রগতিতে বাড়বে সাধারণ মানুষের আয়। শিক্ষিত সমাজকে অন্য রাজ্যে চাকরি করতে যেতে হবে না, কারণ এখানেই আসবে বহু নতুন আর্থিক ক্ষেত্র। অপেক্ষাকৃত অল্পশিক্ষিত গরিব মানুষদের অর্থোপার্জনের সুযোগ বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে। লাদাখি, কাশ্মীরি, ডোগরী, বাল্টি ভাষায় নাটক, সিনেমা, টিভি সিরিয়াল তৈরি হবে। আরও নতুন নতুন জীবিকা প্রবেশ করবে এই রাজ্যে। উন্নত প্রযুক্তি ও আধুনিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার স্বাদ পাবে সাধারণ মানুষ। বাল্মীকি সমাজের মানুষ সংরক্ষণের আওতায় আসছে ৭২ বছর পরে। সরকারি চাকরির দ্বারও তাঁদের সম্মুখে হবে উন্মুক্ত।

লাদাখে কেন্দ্রীয় সরকার এর মধ্যেই বিভিন্ন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কর্মযজ্ঞ শুরু করেছে। কিছু এলাকায় জমিজট কাটলে লাদাখে বসবাসকারী মানুষ এবার এনটিপিসি ও পাওয়ার গ্রিড থেকে সরাসরি বিদ্যুৎ পাবে। সর্বোপরি, একটা নতুন জগৎ পাবে জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখ। অবশ্যই যদি তারা নিজেরাই যাবতীয় উন্নয়নের পথে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। □

স্বস্তিকার বিজ্ঞাপনের দরপত্র (এক সপ্তাহের জন্য)

Back Cover	(Multi Colour)	Rs. 32,000.00
Front Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Back Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Full Page	(Multi Colour)	Rs. 20,000.00
Full Page	(Black & White)	Rs. 15,000.00
Half Page	(Black & White)	Rs. 8,000.00
Qtr. Page	(Black & White)	Rs. 4,000.00

** *বিজ্ঞাপনের টাকা জমা পড়লে বিজ্ঞাপন ছাপানো হবে।*

সন্ত্রাসীর ধর্ম আড়াল করতে ব্যস্ত ছদ্ম ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

'লুঠেরাদের মেরে ছিচে দিবি'— বীরধর্মের স্বয়ং এই বীরবাণী স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষ'কে। সেকুলারি ভঙ্গিতে পাকিস্তানের বিরোধিতা সেকুলারের সংখ্যা কতোটা বৃদ্ধি করে তা বলতে পারব না, কিন্তু নিশ্চিতভাবে তা লুঠেরার সংখ্যা বৃদ্ধি রূপে, আজকের পরিচয়ে যারা সন্ত্রাসী তাদের সংখ্যাতত্ত্বে যোগ আনেই আনে।

গত ২২ এপ্রিল, দুপুরে কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে পাকিস্তানের পোষ্য জঙ্গিদের নৃশংসভাবে বেছে বেছে হিন্দু পর্যটকদের ওপর নারকীয় ভঙ্গিতে গুলি চলল। কী নাম, ধর্ম কী— হিন্দু, শিখ? চালাও গুলি। হিন্দুদের সবচেয়ে বড়ো গৌরব— তারা সবাইকে মর্যাদা দিয়েছে এই দেশে। কত হিন্দু তাই সেকুলার, ভণ্ড সেকুলার, অতি সেকুলার এমনকী প্রো-ফিলিস্তিনি (পড়ুন পাকিস্তানি) হলো, যারা বিশ্বসত্যের সঙ্গে নিজেদের অজ্ঞানকৃত বিচ্ছেদ ঘটাচ্ছে। তারা আজকেও, এই নৃশংস হিন্দু হত্যার পরেও চারদিক যেন শিক্ষিত মূঢ়তায় ভরা। এ যে মানবজাতির অগৌরব! সারা বিশ্বে ধিক্কারের ঝড়। পাকিস্তান যে সন্ত্রাসের আঁতুড়ঘর এবং টার্গেট যে হিন্দুরাই তা আর কি বুঝতে বাকি থাকে! ভারত কড়া পদক্ষেপ নিচ্ছে কূটনৈতিক পদক্ষেপে, ব্যবসায়িক লেন-দেনে, সত্যিই যে এবার ছেদ আনার সময়, কারণ স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় এখন 'ছিচে' দিতে হবেই হবে। পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়া খুব স্বাভাবিক ভাবেই পাকিস্তানি চরিত্র মতোই হবে। পাক প্রতিরক্ষা মন্ত্রী খাজা আসিফ কী সুন্দর বলল, এই ঘটনায় তাদের কিছুই করার নেই। জঙ্গি হামলার সঙ্গে পাকিস্তানের কোনো যোগ নেই।

পাকিস্তানের জাতীয় অর্থনৈতিক পশু গাধা। এই মন্তব্যে গাধারাও হাসছে নিশ্চয়। আবার খাজা আসিফই ক'দিন আগে বলল, ভারতের বিরুদ্ধে তিরিশ বছর ধরে সন্ত্রাসবাদীর কার্যকলাপ চালাচ্ছে পাকিস্তান। বলল কখন? যখন পাকিস্তানের রেঞ্জার্সরা পালাচ্ছে। সেনারা পদত্যাগ করছে, ঠিক তখনই এই স্বীকার খানিক আগ বাড়িয়ে সাধু সাজার প্রচেষ্টা। একটা দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী যদি এই ভাষায় লেখে, দ্বিচারি কথা বলে, বাকি পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়ার ধরন কেমন হবে তা সহজেই অনুমেয়। ভারত বিদ্বেষ যাদের বছরভর সবচেয়ে পছন্দের বিষয় তাদের ঘরের পেশাদার সন্ত্রাসী যখন ভারতের সীমান্তে ২৬ জন হিন্দুর প্রাণ নেয় তা তো তাদের কাছে তখন উল্লাস। ভারত বিরোধী প্ররোচনা তাদের সামাজিক মাধ্যমে, সংবাদে, প্রকাশ্য বার্তায়। ভারত বিদ্বেষের প্রচার এমন পর্যায়ে, যে, ভারতে নিষিদ্ধ ঘোষিত হলো ডন, সামা টিভি, এআরওয়াইয়ের মতো পাকিস্তানি ইউটিউব চ্যানেল। ইর্শাদ ভাট্টি, অসমা শিরাজি, উমর চিমা, মুনিব ফরুকের মতো পাক সাংবাদিকদের চ্যানেল নিষিদ্ধ ভারতে। নিষিদ্ধ ক্রিকেটার শোয়েব আখতারের চ্যানেলও। সেকু-মাকুরা যে সত্যিই জঙ্গিদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মদত দেয়, তা প্রমাণিত হলো বিবিসি-র সংবাদ বোধ বিচারে। তারা এটাকে 'জঙ্গি হামলা' না বলে 'বিদ্রোহীদের হামলা' বলে উল্লেখ করছে।

ভারত এখনো যা যা প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করছে, পদক্ষেপ নিচ্ছে সবটাই এক পুণ্যভূমির সভ্যতার নিরিখে। ভারতীয় বিদ্যা-বোধ-দীক্ষা- চেতনা সবসময় অসঙ্গত হতে বাধা দেয়। তাই ভারত এখনো পাকিস্তানের প্রতি ইজরায়েল সুলভ হয়নি। নির্বিচারে পাকিস্তানি নাগরিক নিধন ভারতের উদ্দেশ্য নয়, লক্ষ্য জঙ্গি নিকেশ। তাই জঙ্গি ফ্যাক্টরি পাকিস্তানকে বহুমুখী কূটনৈতিক প্যাঁচে শ্বাসরোধ করছে ভারত। ইজরায়েলের যুদ্ধবারুদে গাজা ভূখণ্ড নিকেশের মতো পাক অধিকৃত কাশ্মীর-চাইলেই জনশূন্য করতে পারে ভারত। কিন্তু ভারত নৈতিক বুদ্ধির মালিন্য প্রকাশ করবে না। বহু দেশে আক্রমণ হয়, ভারতীয় ভূস্বর্গও আক্রান্ত। এত রক্তের পরেও দেখছি ভারতের অনেক স্থলে 'যক্ষপুরী', যেখানে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে— কেন্দ্র অপদার্থ, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা অপদার্থ, মোদী সরকার বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে— পাকিস্তানের কথা যেন তর্জমা করছে মনে হবে।

সেকুলারদের প্রতিবাদগুলো দেখছিলাম, মনে হচ্ছিল প্রতিবাদ করতে গিয়ে তাদের মনটা ভেতরে ভেতরে গৃহহীনতার ভয়ে কাবু। মনে হচ্ছিল যেহেতু সারা বিশ্ব তীব্র তাদের তাই একটু নিন্দে না করলেই নয়। নিন্দে না করলে, নিন্দে না করার কালো দাগটা থেকে যাবে। তাই বুদ্ধি ধার করে নিন্দে। কৃপণের মতো নিন্দুক যাকে বলে। তারা চিৎকার করে বলছে না— পাকিস্তান মুর্দাবাদ। কিন্তু মোদী মুর্দাবাদ হাজারবার বলেছে। বলছে না হিন্দুদের সুরক্ষা কেন নেই? ভ্রমণে গিয়েও নেই? তারা এখনো বলছে সন্ত্রাসীর ধর্ম হয় না। কিন্তু হত্যা যখন ধর্ম জিজ্ঞেস করে হয়, তখনো তা কি ধর্মনিরপেক্ষ হত্যা? সেকুলাররা এখনো এই ন্যারেটিভটাই প্রমাণও প্রতিষ্ঠিত করতে চায়— বিদ্বেষ

> **ভারতের কমিউনিস্টদের বিদ্যেটা বস্তাপচা সোভিয়েতের থেকে ধার করা। বুদ্ধিটা খাটে ইসলামিক ভোটে। বিচার ছোটে ফিলিস্তিনে। এটাকে ওরা বলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ। আসলে এটা রাষ্ট্র বিরোধিতা।**

ফঃ ২

ছড়াচ্ছে হিন্দুত্ব। 'হিন্দুত্বের জন্য অশান্ত দেশ। ধারা ৩৭০ রদ এবং কাশ্মীরকে কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল ঘোষণার পর থেকেই নাকি কাশ্মীর অশান্ত। ১৯৩০ থেকেই কমিউনিস্ট এজেন্টরা জাতীয় কংগ্রেসে ঢুকে জাতীয়তাবোধে ভাঙন আনে। সমর্থন দাবি করে মুসলিম লিগের। সমর্থন করে পাকিস্তান গঠনের।

পিসি জোশী থেকে জ্যোতি বসু গ্রেট ক্যালকাটা কিলিঙের মতো হিন্দু নরসংহারের জন্য একবারও দুঃখ বা যন্ত্রণা প্রকাশ করেনি। তাদের শাখা-প্রশাখা কুচো কাচা রাজনৈতিক বংশধরেরা তাই আজ কোনো নিয়ম যুক্তিতে 'হিন্দুদের মারল' ব্যানারে লিখে পথে নামে! সত্যিই তো এ তাদের রাজনৈতিক ঘরানা নয়! আমাদের আশা করাটাই বৃথা। এরা তো সেই কমিউনিস্ট যারা, ২০১৭-তে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ওপর জঙ্গি প্ররোচিত কাশ্মীরীদের পাথর নিক্ষেপ করলেও বলেছিল— এরা অ্যান্টি ইন্ডিয়ান নয়। সেই পাথর ছোঁড়া যুবকদের স্বাভাবিক জীবনে আনতে সক্ষম হচ্ছিল উদীয়মান ভারত। বাড়ছিল পর্যটক। বিনিয়োগ। সড়ক যোগাযোগ উন্নতি হচ্ছিল রমরম করে। তখন কিন্তু ওই কমিউনিস্টগুলো একবারও বাহবা দেয়নি। তখনও তারা পথে নেমেছিল ফিলিস্তিনের ন্যায়ের জন্য। যেন আরও এক খিলাফত আন্দোলন করেই ছাড়বে ভারতে। ফারুক আহমেদ দার নামক এক পাথর নিক্ষেপকারী যুবককে যখন ভারতীয় সেনা জেনারেল গগৈ জিপে বেঁধে রাখলেন এবং কোনো শারীরিক আঘাত পর্যন্ত করেননি, তখন সিপিআইএম পলিটব্যুরোর আওয়াজ উঠল— আর্মিদের শাস্তি চাই। কমিউনিস্টদের ওই আওয়াজটাই জঙ্গিদের ক্রমবিকাশের পথ।

এই মুহূর্তে ভোট ভিখারি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, জাতীয়তাবোধের অভাবে ধুঁকছে। এতটা নৃশংস ঘটনা, যখন সারা দেশের ঐক্যবদ্ধ থাকার কথা, সেই আবহে নরেন্দ্র মোদীর দিকে তির্যক বিদ্রূপ এঁকে সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করল মুণ্ডহীন মোদী আদলের এক দেহমূর্তি। ছবির ওপর লেখা 'Gayab'। পাকিস্তান সেনার ডিফেন্স অ্যাটাইচ কর্নেল তৈমুর রাহত— তার ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে ভারতীয়দের গলা কাটার ইশারা দিলেন। পাকিস্তান ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মৌলিক আচরণে কী কাকতালীয় সাদৃশ্য! আসলে সাদৃশ্য অনেক। মিলটা ধরা পড়ল কাকতালীয় ভাবেই। সবাই এমনকী সচেতন মুসলমানরাও জানেন কংগ্রেস টিকে থাকে কেবলমাত্রই মুসলমান ভোটব্যাংকের জোরে। ভারতের দায়িত্বশীল মুসলমানরা অকৃত্রিম ভাবে পহেলগাঁও জঙ্গি হানার তীব্র নিন্দা করছেন। কংগ্রেসের জাতীয় কর্তব্যের ঢং দেখে মনে হচ্ছিল আইডিয়াটা যেন পাকিস্তান সেনার থেকেই আমদানিকৃত। সব আমদানি-রপ্তানি বন্ধ করবে ভারত সরকার। কিন্তু ভারতেরই একাংশ রাজনৈতিক মহল পাকিস্তান প্রেম, ফিলিস্তিন দরদ, আফজল গুরুদের প্রতি মানবাধিকারের জোয়ার আমদানি থামাবে না।

সেই আমদানি আছে বলেই ভারত বিদ্বেষের বাটখারা রাখতে হয় ভারতেরই মধ্যে। অসমের হিন্দু অধ্যাপক সেই আক্রমণকালে জঙ্গিদের সামনে জোরে জোরে কলমা পড়লেন। হিন্দু হয়েও ছদ্মবেশি মুসলমান পরিচয়ে যখন প্রাণে বেঁচে ফিরলেন— তখনোও সেকুলাররা বলল না— নিকেশ করার লক্ষ্য শুধু হিন্দুদেরই। তারা এখনো এই সন্ত্রাসী আক্রমণকে বিশ্বের অন্য সন্ত্রাসী হামলার সঙ্গে এক কক্ষে রাখছে। বলছে সন্ত্রাস দমন হোক। কিন্তু একটিবারও নির্দিষ্ট ভাবে বলছে না— হিন্দুদের ওপর মোল্লাবাদের আক্রমণ বন্ধ হোক। তারা বাংলাদেশে হিন্দু আর্তনাদে যে কারণে চুপ ঠিক সেই কারণেই পহেলগাঁও হিন্দু হত্যায় ধরি মাছ না ছুঁই পানি। মুর্শিদাবাদে যখন একই সময়ে নিজ ভূমিতে পরবাসী হিন্দুরা তখনো চুপ তারা। চুপ মমতা ব্যানার্জি। মোল্লাবাদী জেহাদের রসদ ভারতে জোগান দেয় বাংলাদেশ। বাংলাদেশের মোল্লাবাদীরা আবার পাকিস্তান প্রেমে টইটম্বুর। পাকিস্তানি বিদ্যায় ভরা। যে মমতা ব্যানার্জি নিজের রাজ্যের মোথাবাড়ির হিন্দু নির্যাতনের বিরুদ্ধেই সোচ্চার হন না, তিনি পহেলগাঁওয়ে নিহত হিন্দুদের জন্য কাতর হবেন, সার্বিক হিন্দু সুরক্ষার জন্য জেহাদের বিরুদ্ধে কথা বললেন? হিসেব যে মেলে না। তাই মৃতদেহ ফিরে এলে মমতা ব্যানার্জি সেই পরিবারকে আর্থিক সাহায্য করেন। তবুও জেহাদিদের বিরুদ্ধে সরব হন না। ১০০ দিনের টাকার হিসাব না দিয়েও ফেডারেল সিস্টেমের জোরে টাকা টাকা করে চিৎকার করা যায়। কিন্তু মুর্শিদাবাদের হিন্দুরা ঘর ছাড়া হলে তখনো তিনি জেহাদি তুষ্টীকরণের রাজনীতি করেন। তার মাথায় ঘোরে শুধু একটাই চিন্তা— কাশ্মীরের মানুষের 'আজাদি' কীভাবে আসবে?

পাকিস্তানি টক শো' তে শোনা গেল উত্তর— 'হিন্দুস্তান অনেক বড়ো দেশ। বহু মানুষ নিজের দেশের প্রতি সহানুভূতিশীল নয়।' অরুন্ধতী রায়, মমতা ব্যানার্জি, কংগ্রেস পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি, অন্যান্য বামপন্থী দল, দলিত পার্টি, হিন্দুস্থানের সব লোক তো মোদীর সঙ্গে নেই— পাকিস্তানির এই উত্তর আর যাইহোক, দিনকে দিন, রাতকে রাত বলল। অতএব, এতক্ষণ যা আলোচনা হলো— যারা মোদী বিরোধী তারাই পাকিস্তানের পছন্দের। কাশ্মীর আজাদি মাঙ্গে— স্লোগানের মাইক্রোফোন খরচ তারাই দেয়। যারা কাশ্মীরের আজাদির স্লোগান লেখে, যে মমতার শাসনে যাদবপুরের মতো ক্যাম্পাসে কাশ্মীরের আজাদির দাবি ওঠে কিন্তু পুলিশ তৃণমূল-ভুক্ত, তখন যদি কাশ্মীরের আজাদির ইস্যুতে মমতার ওপর পাকিস্তান টেলিভিশন চ্যানেল একটু আস্থা প্রদর্শন করে, তা কি এমন আহামরি বিষয়! আসলে পহেলগাঁও সন্ত্রাসের পর এই টকশো তাই তা হিসেবে এল। জোহাদের ওপর মমতার কত ভরসা তা নিশ্চিত হলো এই সময়ের সংঘাতে। ভারতীয় সংস্কৃতি নানা মুনির নানা মতকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। তা সাংবিধানিক জোর। কিন্তু প্রচ্ছন্ন পাকিস্তান দরদ— কোনো বিচারেই ব্যক্তিস্বাধীনতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা বলে পার পেতে পারে না। ভারতের কমিউনিস্টদের বিদ্যেটা বস্তাপচা সোভিয়েতের থেকে ধার করা। বুদ্ধিটা খাটে ইসলামিক ভোটে। বিচার ছোটে ফিলিস্তিনে। এটাকে ওরা বলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ। আসলে এটা রাষ্ট্র বিরোধিতা। কংগ্রেস সমাধান চায় কেবলমাত্রই 'এক্স হ্যান্ডেলে'। সন্ত্রাসের সামনে রাজনৈতিক বিভেদের পালে হাওয়া প্রদর্শন সন্ত্রাসের চেয়েও অনিষ্টকর।

যে যেই রাজনৈতিক প্রতীকে বিশ্বাস রাখি, জাতীয় সুরক্ষা স্বাতন্ত্র্যে যতক্ষণ 'আমার তোমার' তফাত থাকবে ততক্ষণ জঙ্গি তোষণ থাকবে। কমিউনিস্ট, বুদ্ধিজীবী বাঙ্গালিদের বিশেষ করে হিন্দু নিধনের বিষয়ে রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডায় অনূঢ়া থাকলে, আগামীদিনে তারা প্রো-পাকিস্তানি হিসেবেই পরিচিত হবেন। সন্ত্রাসীর ধর্ম নেই? সেদিনও, ২০০০, ২০ মার্চ, এই অনন্তনাগ জেলারই চিত্তিসিংপুরা গ্রামে সন্ত্রাসীরা হামলা করল। ৩৬ জন শিখকে হত্যা করল। ঠিক তার একদিন পরেই তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের ভারত সফর ছিল।

২৬/১১ মুম্বই সন্ত্রাসী হামলার মূল পরিকল্পনাকারী তাহাব্বুর রানাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ভারতে সফলভাবে প্রত্যার্পণ করা হলো দিল্লিতে জাতীয় তদন্ত সংস্থার ঘরে। ঠিক তার পরেই পহেলগাঁও সন্ত্রাস। সন্ত্রাসীর সত্যিই যে কোনো ধর্ম (নীতি) হয় না। এতটাই ধর্মহীন যে, সাধারণ নাগরিকের সামনে বন্দুক ধরে। কার্তুজ খোলে ধর্ম (রিলিজিয়ন) জানার পর। এর পরেও যদি সন্ত্রাসী, সন্ত্রাস, নিহত, সবকিছু ধর্মনিরপেক্ষতার সোশ্যাল সায়েন্সে ফাঁকি দেয় তাহলে পরের সন্ত্রাসীর নল আমাকেই তাক করবে। খাজনা দেব সেকুলার হয়ে আর ম্লেচ্ছ বলে দেশকে গালমন্দ করব! আজকে যা বিশ্বের অবস্থা তাতে এই আচরণ জঙ্গিদের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরের পাসওয়ার্ড দেওয়ার সমতুল্য। □

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কেন্দ্র বঙ্গভূমি

সঙ্ঘশতবর্ষ
পর্ব-২

ড. জিষ্ণু বসু

আধুনিক ভারতের নবজাগরণের কেন্দ্র ছিল পশ্চিমবঙ্গ। এই বঙ্গের মনীষীরা হিন্দু জাতীয়তাবোধকে নবজাগরণের হাতিয়ার করেছিলেন। হিন্দু ভাবনায় ভারতীয় জীবনযাত্রার মূল চালিকা শক্তি হিন্দু, হিন্দুত্ব কোনো উপাসনা পদ্ধতি নয় বরং এই দেশের মূল জীবনপদ্ধতি। এটিই সে যুগের বাঙ্গালি প্রবুদ্ধজনেরা তাঁদের রচনা, বক্তৃতা, কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে প্রকাশের প্রয়াস করেছিলেন।

১৮০৩ সালে ভারতের নবজাগরণের অন্যতম পুরোধা পুরুষ রাজা রামমোহন রায় লিখেছিলেন 'তওফাত-উল-মুওয়াহিদিন' নামক ফার্সি ভাষায় পুস্তক। ফরাসি ভাষা সে যুগে খুবই সমৃদ্ধ ভাবা হতো। বহুদিন পরে আদি ব্রাহ্মসমাজ ১৮৮৯ সালে ইংরেজি ভাষায় বইটি অনুবাদ করে। রাজা রামমোহন রায় এই পুস্তকে দেখিয়েছিলেন যে একেশ্বরবাদ ভারতীয়দের কাছে নতুন কিছু নয়। তওফাত-উল-মুওয়াহিদিন নামের অর্থ হলো 'একেশ্বরবাদীদের জন্য উপহার।' এই বইতে বেদ-উপনিষদের গভীর থেকে 'একেশ্বরবাদ' মানে 'মনোথিজম'-এর উপাদান উপস্থাপন করেছিলেন।

মুর্শিদাবাদ, জলপাইগুড়ি, নাটোর-সহ উত্তরবঙ্গে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আন্দোলন হবে এমনটাই ঠিক হয়েছিল ১৭৬১ সালের পূর্ণকুম্ভ মেলায়। প্রয়াগরাজের পূর্ণকুম্ভর সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে দশনামী নাগা সন্ন্যাসী সম্প্রদায় বঙ্গপ্রদেশের গ্রামে গ্রামে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়েছিলেন। ১৭৭১ সালে ১৫০ জন বিদ্রোহী সন্ন্যাসীকে কোম্পানি বিনা কারণে মৃত্যুদণ্ড দেয়। বৈকুণ্ঠপুর-সহ উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকার বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন পণ্ডিত ভবানীচরণ পাঠক। ভগবদ্ভক্তি থেকে দেশভক্তির বিস্তার বঙ্গপ্রদেশেই শুরু হয়েছিল সন্ন্যাসী বিদ্রোহের মাধ্যমে।

সন্ন্যাসী বিদ্রোহ সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই বিদ্রোহের পটভূমিতেই তিনি তাঁর কালজয়ী উপন্যাস 'আনন্দমঠ' লিখলেন।

১৮৮২ সাল মানে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের প্রায় শতবর্ষ পরে লেখা হলো আনন্দমঠ। এই আনন্দমঠ উপন্যাসেই তিনি দেশবাসীকে 'বন্দেমাতরম' গান উপহার দিলেন। মা, তোমাকে বন্দনা করি। দেশমাতৃকার চরণকমলে এক অনবদ্য অর্ঘ্য।

সংস্কৃত বন্দনার মাঝে নিপাট বাংলা ভাষার একটি লাইন, 'তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।' দেশমাতৃকার বর্ণনায় হিন্দুত্বই জাতীয়তা হয়ে উঠেছে। 'ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী/কমলা কমলদল বিহারিণী/বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাম্...'। ভারতবর্ষকে মা দুর্গা, লক্ষ্মী ও দেবী সরস্বতীর সঙ্গে তুলনা করলেন বঙ্কিম।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় ১৮৫৭ সালে লিখেছিলেন 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'। বাংলা সাহিত্যে মরাঠা বীর হিন্দু পাদ পাদশাহি ছত্রপতি শিবাজীর প্রবেশ অঙ্গুরীয় বিনিময়ের মাধ্যমে। বিহারে ফার্সি ভাষার পরিবর্তে হিন্দি প্রয়োগ এবং হিন্দি স্কুল প্রতিষ্ঠায় ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল।

আরব তুর্কি বা উজবেক আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের প্রতিরোধ গল্প, উপন্যাস ও কাব্য কাহিনিতে উঠে আসতে থাকে। এই পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী উপাখ্যান'। আলাউদ্দিন খিলজির নারীলোলুপতা, নিষ্ঠুরতা আর তার বিরুদ্ধে শেষ শক্তিটুকু দিয়ে কীভাবে চিতোরের রানি-সহ সকল নারীপুরুষ প্রতিরোধের চেষ্টা করেছিলেন তার এক বেদনাবিধুর উপাখ্যান এই কাব্যকাহিনি। এই কাব্যকাহিনির দুটি পঙ্ক্তি পরবর্তীকালে স্বাধীনতা সংগ্রামে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়?/ দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে, কে পরিবে পায়'— এই সরল অথচ শক্তিশালী দুটি কথা বঙ্গ তথা সারা দেশের যুব সমাজের মনে স্বাধীনতার স্ফুলিঙ্গ জ্বালিয়েছিল।

কলকাতায় হিন্দুমেলা শুরু হওয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ টার্নিং পয়েন্ট। আজকের ভাষায় যাকে 'গেম চেঞ্জার বলা হয়। রাজনারায়ণ বসু, নরগোপাল মিত্র, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর এমন সব মনীষীদের হাতে সংঘটিত হিন্দুমেলা

স্বাধীনতা সংগ্রামে, স্বদেশী আন্দোলনে সঠিক অর্থে ছিল গেম চেঞ্জার। ১৮৬৭ সালে রাজনারায়ণ বসু 'ন্যাশেনাল' পত্রিকায় একটি অসাধারণ প্রবন্ধ লেখেন— প্রসপেক্টাম অব আ সোসাইটি ফর দ্য প্রমোশন অব ন্যাশেনাল ফিলিং এবং 'দ্য এডুকেটেড নেটিভস অব বেঙ্গল।' এই লেখাটির প্রেরণাতেই নবগোপাল মিত্র, মনমোহন বসু, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুররা সেই বছরই শুরু করলেন হিন্দুমেলা। কলকাতায় হিন্দুমেলায় জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সর্বাত্মক ভূমিকা ছিল। এই হিন্দুমেলাতে কবিতা, গান, কুটির শিল্প, স্বদেশী, আত্মরক্ষার প্রদর্শন সকলের সামনে প্রস্তুত হতো। ১৫ বছরের তরুণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দুমেলায় স্বরচিত কবিতা পাঠ করেছিলেন। দিল্লি দরবার কবিতাটিও তিনি এখানেই পাঠ করেন। ইংরেজ সরকারের নির্মম শোষণ আর সেই অত্যাচার অবিচারকে চাপা দিয়ে দিল্লিতে ইংল্যান্ডের রাজরানিকে বরণের এলাহি ব্যবস্থার নিষ্ঠুরতা উঠে এসেছে এই কবিতায়।

এই হিন্দুমেলা থেকেই প্রথমে 'সঞ্জীবনী সভা' এবং ধীরে ধীরে বিবর্তিত হতে হতে স্বদেশী আন্দোলনে পরিবর্তিত হয়। স্বদেশী আন্দোলনের আগুন এই বঙ্গভূমি থেকে ধীরে ধীরে সারাদেশে দাবানলের মতো ছড়িয়ে যায়।

ইংরেজ ভারতবর্ষের গ্রামে গ্রামে সংস্কৃত শিক্ষার টোল প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিল। ফলে একটি সরকারি সিদ্ধান্তে ভারতবর্ষের এক বড়ো সংখ্যক মানুষ শিক্ষিত থেকে অশিক্ষিত বলে ঘোষিত হয়ে গেলেন। কেবলমাত্র ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শাসন চালানোর জন্য ইংরেজের কেরানি তৈরি করার শিক্ষার প্রয়োজন ছিল। এর বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা।

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে ভবানীপুরে শুরু করেছিলেন ভাগবৎ চতুষ্পাঠী। সতীশচন্দ্র ১৯০২ সালে ডন পত্রিকা এবং পরে ডন সোসাইটি তৈরি করেন। ১৯০৪ সালে বড়লাট কার্জন ইউনিভার্সিটি অ্যাক্ট চালু করেন। দেশীয় রাজা বা সংগঠনের প্রচেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। তারপর যে ঘটনায় ইংরেজের কুমতলব প্রকাশ্যে আসে তা হলো বঙ্গভঙ্গ আইন। ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিভাবান, প্রতিবাদী বঙ্গপ্রদেশকে ভেঙে দেওয়ার প্রচেষ্টা।

বঙ্গের জাতীয়তাবাদী মনীষীরা বোঝেন দেশের মানুষকে সঠিক শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। ১৯০৫ সালের ১০ ডিসেম্বর পার্কস্ট্রিটে 'ল্যান্ড হোল্ডার্স সোসাইটি'-র বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দেড় হাজার শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। ছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক, ব্রজেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী ও অরবিন্দ ঘোষের মতো প্রবুদ্ধজনেরা। সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় তৈরি হলো 'বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ'। স্থাপিত হয় বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ। বরোদা এস্টেটের মাসিক ৭৫০ টাকার চাকরি ছেড়ে অরবিন্দ ঘোষ এই কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে যোগ দেন। সামান্য বেতনে। অরবিন্দ ঘোষ অধ্যক্ষ থাকার সময়ই যুগান্তর, কর্মযোগিন ও বন্দেমাতরম্ পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। আজকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম রূপ সেই সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ভাগবৎ চতুষ্পাঠী।

স্বাধীনতা সংগ্রামে এই বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ-এর খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এই ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির অধীনে একটি মেডিক্যাল কলেজও প্রতিষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার এই মেডিক্যাল কলেজের প্রথম ব্যাচের ডাক্তারিতে স্নাতক হন। নাগপুর থেকে তাঁকে কলকাতায় পাঠানো হয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদে ডাক্তারি পাঠ পড়ার জন্য।

আসলে ডাক্তারি পড়াটা ছিল ছুতো। ডাঃ বালকৃষ্ণ মুঞ্জে কেশবরাওকে ডাক্তারি পড়তে কলকাতায় পাঠানোয় এই মরাঠি তরুণ বঙ্গের সশস্ত্র বিপ্লবীদের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পান। তিনি কলকাতায় পুলিনবিহারী দাসের অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন।

এই অনুশীলন সমিতির জন্ম হয়েছিল ১৯০২ সালে। পূর্ববঙ্গে ঢাকায় এই সংগঠনের নাম হয় অনুশীলন সমিতি। এপার বঙ্গে কলকাতাতে শুরু হয় যুগান্তর সমিতি। অনুশীলন সমিতির প্রতীক চিহ্নে লেখা ছিল রামায়ণের সেই বিখ্যাত সংস্কৃত শ্লোক 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী,' সেই সঙ্গে নিজে ইংরেজি ভাষায় লেখা ছিল 'অখণ্ড ভারত'। দেশের অগ্রগণ্য নেতৃত্ব ঢাকা অনুশীলন সমিতির পুলিনবিহারী দাসকে কলকাতায় সংগঠনের কাজ দেখভাল করার জন্য এখানে নিয়ে আসেন। এই সিদ্ধান্তের অন্যতম কারণ ছিল শ্রীঅরবিন্দের অধ্যক্ষতায় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের মহাবিদ্যালয় শুরু হয়ে গিয়েছিল।

পুলিনবিহারী দাসের আত্মজীবনী 'আমার জীবন কাহিনি' গ্রন্থে তিনি তাঁর বিপ্লবী জীবনের গুরু প্রমথনাথ মিত্রের অনুশীলন সমিতির দীক্ষাদানের অনুষ্ঠানের বর্ণনা করেছেন। বিপ্লবী শিক্ষার্থী ও তাঁর গুরু দুজনই একদিন হবিষ্যান্ন খেয়ে প্রস্তুত হতেন। দীক্ষার দিনে সকাল থেকে উপবাস থেকে পুণ্যস্নান করে আসতেন। তারপর প্রমথনাথ মিত্র অপূর্ব জলদগম্ভীর স্বরে বেদমন্ত্র পাঠ করতেন। সেই বিপ্লবীরা ইংরেজ সরকারের ভিত নড়িয়ে দিয়েছিলেন।

সে যুগে বিপ্লবীদের মধ্যে অন্যতম বিদুষী নারী ছিলেন সরলাদেবী চৌধুরানী। তিনি তাঁর আত্মজীবনী 'জীবনের ঝরাপাতা' গ্রন্থে লিখেছেন বীরাষ্টমী ব্রত পালনের কথা। ঠাকুর পরিবারের এই বীরাঙ্গনা বর্ণনা করেছেন বীরাষ্টমী ব্রতের মন্ত্রগুলি 'বীরাষ্টম্যাং মহাতিথৌ পূর্বপূর্বগতান বীরান্/নমস্কুর্য ভক্তিপূর্বং পুষ্পাঞ্জলিং দদাম্যহম্।।

সানুজং শ্রীরামচন্দ্র, রঘুকুলপতিশ্রেষ্ঠম্/ বীরাষ্টম্যাং নমস্কুর্য পুষ্পাঞ্জলিং দদাম্যহম্।।'

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, মর্যাদাপুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রের আশীর্বাদ নিয়ে বিপ্লবী জীবন শুরু করতেন বঙ্গের অগ্নিযুগের বীরেরা।

ভারতের নবজাগরণের প্রাণকেন্দ্র ছিল বঙ্গ। স্বদেশী আন্দোলনের জন্মভূমি এই বঙ্গদেশ। সশস্ত্র বিপ্লবের সূচনাক্ষেত্রও ছিল এই বঙ্গদেশ। প্রতিটি ক্ষেত্রেই হিন্দু ভাবনা থেকেই দেশভক্তির পাঠ নিতেন বঙ্গের মনীষীরা।

আধুনিক ভারতে 'হিন্দুত্ব' এই শব্দটিও প্রথম প্রয়োগ করেছিলেন এক বাঙ্গালি মনীষী। তিনি চন্দ্রনাথ বসু। ১৮৯২ সালে তার লেখা 'হিন্দুত্ব : হিন্দুর প্রকৃত ইতিহাস' নামে একটি গ্রন্থের মাধ্যমে নতুন যুগের সূচনা করেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গানে নিত্যপূজার আরাধ্যা জননী আর দেশমাতৃকা এক হয়ে গেছেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এই ভিত্তিভূমি তৈরি হয়ে গিয়েছিল। এই ভাবনা স্বাভাবিক এবং স্বতঃস্ফূর্ত ছিল।

'চল সমরে দিব জীবন ঢালি, জয় মা ভারত জয় মা কালী'। তাই কেবলমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাব-আন্দোলন নয় উনবিংশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত বঙ্গের হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলনই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার— ভিত্তিভূমি তৈরি করেছিল। □

সেকুলারিজম ছুঁড়ে ফেলে সন্ত্রাসবাদীদের পরিচয় জেনে নিক ভারতবাসী

শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী

আচ্ছা আপনি লস্কর-ই-তৈবা মানে জানেন? জানেন না, না? জইশ-ই-মহম্মদ? তা ও জানেন না? লস্কর-ই-তৈবা মানে আল্লার সেনা। জইশ-ই-মহম্মদ মানে মহম্মদের সেনা। সারা বিশ্বে এই রকম ১৫০টির বেশী সন্ত্রাসবাদী সংগঠন আছে যাদের মানে খুঁজলেই আপনি অবাক হবেন। তারা প্রত্যেকেই আল্লার সেনা, মহম্মদের প্রতিনিধি। হামাস হোক, আল কায়েদা হোক, লস্কর-ই-তৈবা হোক, জইশ-ই-মহম্মদ হোক বা হোক বাংলাদেশের আনসারুল্লা বাংলা টিম, জামাত উল মুজাহিদিন অথবা এই ভারতের সিমি বা পিএফআই— সবার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক। বিশ্বজুড়ে সেই আল্লার মহান আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা। যতক্ষণ না তা পূরণ হচ্ছে ততক্ষণ হত্যা, ধর্ষণ, লুট সব বৈধ। তার জন্যই বিশ্বজুড়ে হত্যালীলা।

ভ্রান্ত সেকুলারিজমের কল্পনাবিলাস আজ এদেশের হিন্দুদের ধ্বংসের দোরগোড়ায় দাঁড় করিয়েছে। সে ১৯৪৬ সালের নোয়াখালি- কলকাতাই হোক বা হোক আজকের পহেলগাঁও। ৭৭ বছর ধরে 'একই বৃন্তে দুই কুসুমের গল্প' এদেশে 'গজওয়াতুল-হিন্দ' প্রতিষ্ঠার কারণ হয়ে উঠেছে। সেই মহান উদ্দেশ্যে বেছে বেছে হিন্দু হত্যা কাশ্মীরের পহেলগাঁওতে। ইসলামি জঙ্গিদের দ্বারা ২৬ জন হিন্দুহত্যা। ভারতের হিন্দুদের বিরুদ্ধে আল্লা-সেনাদের বিশুদ্ধ জেহাদ। মহিলাদের মাথার সিঁদুর দেখে, পুরুষদের প্যান্ট খুলে সুন্নত আছে কিনা চেক করে, হিন্দু নিশ্চিত হয়ে ঠাণ্ডা মাথায় গুলি। আমাদের উজবুক নেতাদের মতো তারা ব্রাহ্মণ না দলিত, কায়েত না জনজাতি জাত জানতে চায়নি। বাঙ্গালি না বিহারি, গুজরাটি না মাড়োয়ারি জানতে চায়নি। আপনি এসসি, এসটি, ওবিসি কিনা সেটাও জিজ্ঞাসা করেনি। শুধু জিজ্ঞেস করেছে ধর্মটা কী? তারপরেই হত্যা। ইসলামিক জেহাদের এটাই রূপ। এ কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ান, সামশেরগঞ্জ, কাশ্মীরের পহেলগাঁওতে, যে কোনো জায়গায় একই প্যাটার্ন— হিন্দু খুঁজে খুঁজে মারা। কারণ আমরা হিন্দুরা এখনো ধর্মনিরপেক্ষতার জামা পরে বসে আছি।

মাত্র এক সপ্তাহ আগে খুব ধমুধাম করে বিয়ে সেরেছিলেন নব দম্পতি। হাতের মেহেদির রং তখনো লাল টকটকে। কিন্তু কেবলমাত্র হিন্দু হওয়ার অপরাধে মধুচন্দ্রিমা

শেষ হওয়ার আগেই জেহাদিরা কেড়ে নিল স্ত্রীর সিঁথির সিঁদুর। ইসলামি জেহাদির হাতে হত্যা হয়ে যাওয়া আর এক হতভগিনী কলকাতার বিতান অধিকারীর স্ত্রী বলছেন, 'ওরা প্রথমে জিজ্ঞাসা করল আপনি কী মুসলমান? কলমা পড়তে জানেন? হিন্দু না মুসলমান বলতে বললো। তারপর গুলি চালিয়ে দিল'। স্বামী-ছেলের সঙ্গে কাশ্মীর বেড়াতে গিয়েছিলেন পল্লবী, দুপুর দেড়টা নাগাদ তারা ছিলেন কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে। আচমকা তিন-চার জঙ্গি বন্দুক হাতে তাদের দিকে এগিয়ে আসে। নাম জিজ্ঞাসা করে হিন্দু পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার পর গুলি চালায়। চোখের সামনে স্বামী মঞ্জুনাথ রাওকে লুটিয়ে পড়তে দেখে পল্লবী জঙ্গিদের বলেন, 'স্বামীকে মেরে দিয়েছ। আমাকেও মেরে ফেলো।' জঙ্গিরা সদ্য স্বামীহারা পল্লবীকে বলে, 'তোকে মারবো না, যা মোদীকে গিয়ে বল।' কাশ্মীরে জঙ্গি হামলায় নিহত পশ্চিমবঙ্গের তিন। পুরুলিয়ার বাসিন্দা আইবি আধিকারিক মণীশরঞ্জন, পাটুলির বিতান অধিকারী, বেহালার সমীর গুহ। হিন্দু হয়ে জন্মানোই কাল হয়ে দাঁড়ালো তাঁদের। কাজী নজরুল বলেছিলেন 'হিন্দু না ওরা মুসলমান ওই জিজ্ঞাসে কোনজন'? আজ ইসলামিক সন্ত্রাসীরা ধর্ম জিজ্ঞেস করে করে মারছে। যাঁরা বলেন সব মানুষ সমান তাঁদের জেনে রাখা ভালো, যারা মরেছে আর যারা মেরেছে তারা কিন্তু সকলেই মানুষ, সবার রক্তই লাল। শুধু ধর্মটা আলাদা।

কী বুঝছেন সেকুলার বাঙ্গালি? সন্ত্রাসবাদের ধর্ম হয় কি হয় না? এবার পহেলগাঁওয়ে সন্ত্রাসীরা পরিচয়পত্র পরীক্ষা করে, তাদের প্যান্ট খুলে পর্যবেক্ষণ করে, কলমা পাঠ করতে বলে, যারা মুসলমান নয়

তাদের হত্যা করে কী প্রমাণ করলো? প্রমাণ করল যে সন্ত্রাসের ধর্ম হয়। মুর্শিদাবাদ হোক বা কাশ্মীর সব জায়গাতেই সন্ত্রাসের ধর্ম আছে। যারা এই ঘটনাকে অন্য কিছু বোঝানোর চেষ্টা করছেন তারা এই লস্কর-ই-তৈবা জঙ্গিদের থেকেও ভয়ংকর।

অথচ এখনো সেকুলারিজমের কিছু গর্ভস্রাব এই জেহাদিদের সমর্থনে যুক্তি সাজাচ্ছে। মহম্মদ সেলিম বলছেন সন্ত্রাসবাদের দায় বিজেপির। মানে হিন্দু সমাজের দায়। সন্ত্রাসবাদীদের আড়াল করার চেষ্টা। ধরুন, সেদিন যদি পহেলগাঁওতে পশ্চিমবঙ্গের এই সেকুলাররা থাকতেন কী হতো? প্যান্ট খুলে পরীক্ষা দিতে হতো। মহম্মদ সেলিম তো বেঁচে যেতেন, কিন্তু বিমান, সুজন? কার্ল মার্কসের চোদ্দপুরুষ এলেও তাঁদের বাঁচাতে পারতেন না। এসব দেখে একটা জিনিস পরিষ্কার জেহাদিদের গুলি থেকে কার্লমার্কস বা লেনিন বামপন্থীদের বাঁচাতে পারে না, বাঁচাতে পারে মহম্মদ সেলিমের কলমা। তবে আজ থেকে বামপন্থীরা না হয় দাস ক্যাপিটাল ছেড়ে সেলিমের আহ্বানে কলমা পড়া শুরু করুক।

বামপন্থীদের চরিত্র দেখুন, পাশের হিন্দুটাকে যখন জেহাদিরা গুলি করছে তখন পশ্চিমবঙ্গের এক সেকুলার বামপন্থী অধ্যাপক দেবাশিস ভট্টাচার্য কেমন অবলীলায় প্রাণভয়ে চিৎকার করে কলমা পড়ছে। পৈতেধারী ব্রাহ্মণ সন্তান হয়েও যে দেবাশিস কোনোদিন ভগবদ্গীতার দু-চারটি শ্লোক পড়ে দেখেননি পাছে সাম্প্রদায়িক হিন্দুর তকমা লেগে যায় সেই ভয়ে, তিনি কিন্তু সেকুলারিজমের সারমর্ম বুঝে আগে ভাগেই কলমাটা মুখস্ত করে রেখেছেন। যেই দেখছেন পাশের হিন্দুটা গুলি খেয়েছে অমনি খোলস পালটে মুসলমান হয়ে গেছেন। এরাই ধর্মকে আফিং বলে গালাগালি দিয়ে পরক্ষণেই প্রাণ বাঁচাতে কলমা পড়ে এসে আপনাদের শেখাবেন 'হিন্দুত্ব' কত খারাপ। সেকু-মাকুরা জীবনে কোনোদিন রামায়ণ- মহাভারত পড়েননি। তার জন্য কি হিন্দুরা কোনোদিন তাদের মাথায় বন্দুক ঠেকিয়েছে? এবার কিন্তু নিস্তার নেই। শীঘ্রই কলমা, কুরআন, হাদিস মুখস্ত করা শুরু করুন। পারলে দেড় ইঞ্চি কেটে সুন্নত করে রাখুন, বলা যায় না প্রাণ বাঁচলেও বেঁচে যেতে পারে। কারণ ওরা প্যান্ট খুলেই চেক করেছিল। এই বামপন্থী কেঁচোদের দেখে ঘৃণা হয়।

এবার আমাদেরও বোধহয় একটু মাওসেতুং-এর 'বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস' এই মতে বিশ্বাসী হতে হবে। বামপন্থী অধ্যাপক দেবাশিস ভট্টাচার্য যদি বন্দুকের সামনে কলমা পড়তে পারেন, তবে হিন্দুরা তাকে বন্দুকের নলের সামনে গীতা মুখস্ত করাতে পারবে না কেন? বামপন্থীদের কাছে কলমা পড়া যদি ধর্মনিরপেক্ষতা হয়, তবে গীতা পড়া সাম্প্রদায়িক কেন হবে? ওদেরকেও ডান্ডার জোরে গীতা-রামায়ণ-মহাভারতের পাঠ দিতে হবে।

আর কী আশ্চর্য দেখুন, যেসব শিল্পী-সাহিত্যিক-অভিনেতারা এদেশে হিন্দুশক্তির উত্থানে ভারতে থাকতে ভয় পেতেন, কথায় কথায় অ্যাওয়ার্ড ফেরত দেওয়ার কথা বলতেন, তারা সব কেমন নিশ্চিন্তে ঘুম দিচ্ছেন। এখন আর নাসিরউদ্দিন, আমির, সালমান, শাহরুখ, শাবানা, জাবেদ আক্তারদের এদেশে থাকতে ভয় লাগছে না। পশ্চিমবঙ্গের দাঁড়কাক—

চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ (সিডিএস) বিপিন রাওয়াত বলেছিলেন ভারতকে সবসময় আড়াই খানা ফ্রন্টে লড়তে হয়। এক পাকিস্তান, দুই চীন, আর হাফ হলো এদেশের ভেতরে বসে থাকা ভারত বিরোধী শক্তি।

সুভা, জয়, কৌশিক, অপর্ণা, শ্রীজাত, নচিকেতোরা, যাঁরা হিন্দু হয়ে হিন্দুর এই বর্বরোচিত হত্যার সময় মুখে কুলুপ এঁটেছেন তাঁরা আদতে আজ স্বর্গে না মর্গে?

পহেলগাঁও ঘটনার পর হিন্দু আক্রোশে কদিন গর্তে লুকিয়ে থাকার পর কংগ্রেস আবার তার স্বমহিমায় ফিরতে শুরু করেছে। জাতীয় কংগ্রেসের সর্বজনীন ভগ্নীপতি রবার্ট বঢরা বলেছেন, 'পহেলগাঁও হত্যাকাণ্ডের জন্য হিন্দুত্ব দায়ী'। কংগ্রেস নেতা বিকে হরিপ্রসাদ বলেছেন, 'পাকিস্তান মোটেই আমাদের শত্রু নয়'। মহারাষ্ট্রের বিজয় বরেট্টিবাড় বলেছেন, 'টেররিস্টদের কোনো জাত হয় না'। আর কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রীর উক্তিতো আজ পাকিস্তানের মিডিয়ায় সবচেয়ে বেশি পপুলার— 'পহেলগাঁও কাণ্ডে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ নেই, তাই পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে যাওয়া অনুচিত।'

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীও বলে দিয়েছেন 'সন্ত্রাসের কোনো ধর্ম হয় না'। তার দৃষ্টিতে যে জেহাদিরা অন্তর্বাস খুলিয়ে খুলিয়ে দেখে নিয়ে মেরেছে তারা বোধহয় পুরুষ পর্যটকদের অন্তর্বাসের কোম্পানি পরীক্ষা করছিল, শুধুমাত্র হালাল সার্টিফায়েড জাঙ্গিয়া পরেনি বলেই গুলি চালিয়েছে। যে সন্ত্রাসবাদীরা কলমা পড়াচ্ছিল, মুখ্যমন্ত্রীর মতে তারা হয়তো হিন্দুরা সর্বধর্মের পাঠ ঠিকমতো পড়েছে কিনা তার পরীক্ষা নিচ্ছিল। আর যে টেররিস্টরা আমাদের ঘরের মা-বোনেদের কপালের সিঁদুর চেক করছিল মুখ্যমন্ত্রীর বুদ্ধিতে তারা বুঝি তাদের কপালে রাঙাজবা না খুকুমণি কোন কোম্পানির সিঁদুর লাগিয়েছে তা পরীক্ষা করে দেখছিল। সেদিন যদি পহেলগাঁওতে-ফিরহাদ-সিদ্দিকুল্লা- কুণাল-ব্রাত্যরা বেড়াতে যেতেন, তবে ফিরহাদ-সিদ্দিকুল্লারাতো বেঁচে যেতেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য কুণাল-ব্রাত্যদের, সেদিন জাঙ্গিয়া চেকিং-এ তাদের ধরা পড়ে প্রাণ দিতে হতো।

বামপন্থীদের দেশপ্রেম অবশ্য অনেকটা জাঙ্গিয়ার বুক পকেটের মতো। পহেলগাঁওতে ২৬ জন হিন্দু হত্যার আক্রোশে সারা দেশ যখন প্রতিশোধের

আগুনে ফুঁসছে, তখন এদেশের চিরন্তন বিশ্বাসঘাতক কমিউনিস্টরা পাকিস্তানের পক্ষে দাঁড়িয়ে গেলেন। বিমান বসু বললেন, 'পাকিস্তানের কিন্তু পরমাণু বোমা আছে'—অর্থাৎ ভারতের জনমানসকে দুর্বল করে দেওয়া, তাদের মনে পাকিস্তানের ভয় ঢুকিয়ে দেওয়া। ভাবটা এমন, পাকিস্তানের হাতে পরমাণু বোমা আছে তা কমরেডরা ছাড়া আর কেউ জানেন না। ১৯৪৭-এ এরা ভারত ভাগের জন্য মুসলিম লিগের দাবিকে সমর্থন করেছিল। এরাই ১৯৬২ সালে চীন-ভারত যুদ্ধে ভারত যখন রক্তাক্ত হচ্ছিল, আকসাই চীন থেকে অরুণাচল পর্যন্ত চীনের আগ্রাসন চলেছিল, তখন এরা চীনের পক্ষ নিয়েছিল। সিপিএম নেতারা বলেছিলেন, 'চীন আগ্রাসন করেনি, ভারতই সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে যুদ্ধ বাধিয়েছে। এসএ ডাঙ্গে বলেছেন, ভারতের শত্রু চীন নয়, পশ্চিমি সাম্রাজ্যবাদ। হরিশর্মা বলেছিলেন, ভারতই সীমান্তে উত্তেজনা তৈরি করছে। আর আমাদের প্রবাদপ্রতীম নেতা জ্যোতি বসু সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়েছিলেন, 'ভারতের সীমান্ত নীতি ভুল, যুদ্ধ অনিবার্য ছিল না। চীনের উদ্বেগ যুক্তিযুক্ত'। ১৯৯৯ সাল কার্গিল যুদ্ধের সময়ও সিপিএম সেনাবাহিনীর মনোবল ভাঙতে যুদ্ধ বিরোধী সভা-সমিতি, সমাবেশ করেছিল। ২০১৭ সালে ডোকলাম ও ২০২০ সালে গালওয়ানে চীন-ভারত সংঘর্ষের সময় এরা নরেন্দ্র মোদীকে 'জাতীয়তাবাদী উত্তেজনা' ছড়াচ্ছে বলে দোষারোপ করেছিল। সীমান্তে ভারতীয় সৈনিকরা যখন যখন শত্রুদের সঙ্গে লড়াই করছে তখনই পার্লামেন্টে, গ্রামেগঞ্জে এই সিপিএমের নেতারা চীন-পাকিস্তানের বন্দনা আর ভারতের বিরোধিতা করেছে। আজ পহেলগাঁও ঘটনার পরেও তার অন্যথা হয়নি। দু'একদিন চুপ থাকার পর কেমন ধীরে ধীরে কৃমিকীটের দল গর্ত থেকে বেরিয়ে এসেছে, পাকিস্তানের পক্ষে প্রচার শুরু করেছে। অবশ্য এ মোটেই আশ্চর্যের নয়। যারা মুর্শিদাবাদে জেহাদিদের হাতে নিহত নিজেদের দুই হিন্দু কর্মীর নিশংস হত্যার সামান্য প্রতিবাদটুকু করতে পারে না, তারা করবে কাশ্মীরে হিন্দু হত্যার প্রতিবাদ?

পাকিস্তানপ্রেমী ইসলামি মোল্লা- মৌলবি- জেহাদিদের সহজে চেনা যায়, তারা এদেশের প্রকাশ্য শত্রু; কিন্তু হিন্দু হয়েও যারা প্রতিনিয়ত হিন্দুর সর্বনাশ করে চলেছে, সেই হিন্দু নামধারী শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রথম লড়াই করতে হবে দেশবাসীকে।

ঝাড়খণ্ডের এক মৌলবি নওশাদ উর্দুতে লিখেছিল, 'ধন্যবাদ পাকিস্তান। ধন্যবাদ লস্কর-ই-তৈবা। আল্লা তোমাদের দীর্ঘজীবী করুক। আমিন, আমিন। আমরা আরও খুশি হব যদি তোমরা আরএসএস, বিজেপি, বজরং দল এবং মিডিয়াকে নিশানা করো'। যারা বলেন হিন্দু-মুসলমান নয়, আগে পরিচয় হোক আমরা ভারতীয়, আমরা মানুষ'—তা ঝাড়খণ্ডের এই মৌলবিও ভারতীয়, দেখতে মানুষই বটে। এদের সঙ্গে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি করা যায়? এদের সঙ্গে 'মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম'? এই মৌলবি 'ধন্যবাদ জ্ঞাপনটা' পাবলিকলি করে ফেলেছেন। তাই ফেঁসে গেছেন। এরকম কতকোটি যে মনে মনে 'ধন্যবাদ জ্ঞাপন' করে চলেছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই। এদের রক্তে হিন্দুদের প্রতি কেবল ঘৃণা আর বিদ্বেষ। এই পশ্চিমবঙ্গেও আছে সেই রক্ত বীজের ঝাড়। যারা এদেশে থেকে এদেশের খেয়ে 'কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি'র স্লোগান তোলে। আজ সময় এসেছে এদের খুঁজে খুঁজে বের করে ট্রিটমেন্ট দেবার। সন্ত্রাসের কোনো ধর্ম নেই এই ন্যাকামো ছাড়ুন। পহেলগাঁওয়ের জেহাদিরা পর্যটকদের পরিচয়পত্র পরীক্ষা করেছে, তাদের প্যান্ট খুলেছে, কলমা পড়তে বলেছে এবং বেছে বেছে হিন্দুদের হত্যা করেছে। তার মানে সন্ত্রাসের ধর্ম হয়। আপনি যতই সেকুলারগিরি কপচান, দিনের শেষে আপনি কাফেরই থাকবেন।

চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ (সিডিএস) বিপিন রাওয়াত বলেছিলেন ভারতকে সবসময় আড়াই খানা ফ্রন্টে লড়তে হয়। এক পাকিস্তান, দুই চীন, আর হাফ হলো এদেশের ভেতরে বসে থাকা ভারত বিরোধী শক্তি। তাঁর কথা সত্যি প্রমাণিত করেছে, করে চলেছে এই সিপিএম-টিএমসি-কংগ্রেস-সমাজবাদী দলের লোকেরা। তারা প্রতিনিয়ত হিন্দু হয়েও এদেশে হিন্দুর সর্বনাশ করে চলেছে। পাকিস্তানপ্রেমী ইসলামি মোল্লা-মৌলবি-জেহাদিদের সহজে চেনা যায়, তারা এদেশের প্রকাশ্য শত্রু; কিন্তু হিন্দু হয়েও যারা প্রতিনিয়ত হিন্দুর সর্বনাশ করে চলেছে, সেই হিন্দু নামধারী শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রথম লড়াই করতে হবে দেশবাসীকে।

ঘরের বাইরে যুদ্ধটা ভারত সরকার সামলে নেবে। কিন্তু ঘরের ভিতরে যুদ্ধটা আমার এবং আপনার। কাশ্মীর যে কদিন ভারত সরকারের অধীনে ছিল সে কদিন কিছু হয়নি। এবং যখনই ওখানে আব্দুল্লার সরকার এল, কাশ্মীরে আবার একই খেলা শুরু হলো। এদের হাতে ক্ষমতা গেলে এটাই হয়, ঠিক যেমন পশ্চিমবঙ্গে হচ্ছে। এখনো যদি আমরা না জাগি, নিজেদের প্রস্তুত করি, আমাদের পশ্চিমবঙ্গেও অনেক পহেলগাঁও দেখতে হবে। বিতানবাবুর স্ত্রী কলকাতা বিমানবন্দরে তাঁর স্বামীর দেহ নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলছেন, 'ও মোদীজীকে ভরসা করে এসেছিল। ও মোদীজীকে খুব মানত। হিন্দু হওয়ার জন্য মেরে দিল।' আমরা সাধারণ হিন্দুরা অর্থনীতি বুঝি না, ডিপ স্টেট বুঝি না, কে ভারতকে যুদ্ধে নামাতে চায় তা বুঝি না। আমরা দেশ বুঝি, হিন্দু বুঝি। আমরা সাধারণ হিন্দু বিতানবাবুর মতোই বিশ্বাস করি, মোদীজী আমাদের বাঁচাবেন। ওরা চাইছে আমরা যেন হিন্দু বলতে ভয় পাই। ওদের দ্বিগুণ আগ্রাসী ভাবে হিন্দু ঐক্য দেখিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে, হিন্দু জেগেছে। এক হয়েছে। □

ভারতবাসী কাশ্মীরে ইসলামি সন্ত্রাসবাদের যোগ্য জবাব চায়

শিতাংশু গুহ

তারা শুধু ধর্ম জিজ্ঞাসা করেছিল। নিশ্চিত হওয়ার জন্য প্যান্ট খুলে পরীক্ষা করে। মুসলমান নয় নিশ্চিত হবার পর মাথায় গুলি করে হত্যা। একজন নয়, একে একে ২৬ জনকে। যারা এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটাল তারা ইসলামি সন্ত্রাসবাদী। একদল লোক গলা বাড়িয়ে বলে এবং বলছে, সন্ত্রাসবাদীদের কোনো ধর্ম হয় না। কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ের ঘটনায় আবার প্রমাণিত হলো, সব মুসলমান সন্ত্রাসবাদী নয়, কিন্তু সব সন্ত্রাসবাদীই মুসলমান।

সকালে সংবাদটি দেখার পর মনটা বিষাদে ভরে যায়। একটি টুইট করি। তাতে লিখি— 'নিউইয়র্ক টাইমসকে ধন্যবাদ। কাশ্মীরে যা ঘটেছে তা ইসলামি মোল্লাবাদের প্রকৃত চেহারা।' আরও লিখি— 'আমেরিকা যেমন আফগানিস্তান বা ইরাককে শায়েস্তা করেছে, ভারতের উচিত এই শয়তানদের শিক্ষা দেওয়া। সজোরে আঘাত হানতে হবে।' কপি দিই ট্রাম্প, নরেন্দ্র মোদী, তুলসী গ্যাবার্ড, নিউইয়র্ক টাইমস্, পিটিআই, ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংহ এবং ভারতের দৈনিক যুগশঙ্খ পত্রিকাকে। ফেসবুকেও শেয়ার করি।

কাশ্মীরে যখন এই নির্মম ঘটনা ঘটে, তখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সৌদি আরবে। তিনি সফর সংক্ষিপ্ত করে দেশে ফিরে আসেন। আসার আগে তিনি নিশ্চয় সৌদি বাদশার সঙ্গে কথা বলেছেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এবং রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন ফোনে মোদীজীর সঙ্গে কথা বলেছেন। ইজরায়েল ওই ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। এই ঘটনা যখন ঘটল তখন ক্যাথলিকদের সর্বোচ্চ আস্থাপুরুষ পোপ সদ্যপ্রয়াত। তারা শোকাহত। মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স তখন সপরিবারে ভারতে অবস্থান করছেন।

পাকিস্তানি মদতপুষ্ট লস্কর-ই-তৈবার একটি সাব গ্রুপ এই হত্যাকাণ্ডের দায় স্বীকার করেছে। ইসলামিক স্টেট, আলকায়েদা, বোকোহারাম, লস্কর-ই-তৈবা অথবা বাংলাদেশের আনসারুল্লা বাংলা টিম, আল্লার দল, মহম্মদের দল, হেফাজতে এমনই অসংখ্য ইসলামি জঙ্গিগোষ্ঠীর চরিত্র এরকমই। এরা সবাই ইসলামি খেলাফত প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এরা শুধু মানুষ হত্যা করে তাই নয়, মেরে আবার গর্বের সঙ্গে দায় স্বীকার করে। মজহবের নামে এমন নৃশংস প্রহসন শুধু এরাই করতে পারে এবং এদেরই মানায়।

কাশ্মীর হোক, বাংলাদেশ বা পকিস্তান অথবা সিরিয়া এমনকী ফিলিস্তিন সর্বত্র এদের একই চেহারা। কখনো স্বাধীনতার নামে, কখনো মুক্তি সংগ্রামের নামে, কখনো ইসলাম রক্ষার জন্য সন্ত্রাস এদের অপরিহার্য। গাজার জন্য এদের সংগ্রাম দেখা গেছে। ২০২৩ সালে ৭ অক্টোবর হামাস জঙ্গিরা কয়েকশো ইহুদিকে পণবন্দি করে, আজও অনেক বন্দি— কোনো মুসলমানকে এর নিন্দা করতে দেখা গেছে? দেখা যায়নি, কারণ এদের মানবতা শুধুমাত্র ইসলামভিত্তিক। বাংলাদেশেও ইসলাম-ভিত্তিক মানবতার সর্বশেষ নজির রাখছেন ওই দেশের ধর্ম উপদেষ্টা। তিনি আবার বড়ো গলায় বলছেন, বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর কোনো অত্যাচার হয় না।

ভারত এখন কী করবে? সেটি অবশ্য ভারতের সিদ্ধান্ত। তবে বিশ্বব্যাপী শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ চাইছেন ভারত কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করুক। শান্তির জন্যও কখনো কখনো যুদ্ধের প্রয়োজন হয়। ভারত তো যুদ্ধ করতে ভয় পায় না। বহুবার পাকিস্তানকে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। এবার অবশ্য ভাতে মারার সমস্ত ব্যবস্থা করেছে, এখন শুধু হাতে মারতে বাকি। ইসলামি সন্ত্রাবাদ সমগ্র বিশ্বের পক্ষে হুমকিস্বরূপ। ভারতই এদের নির্মূল করে বিশ্বে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পারে।

বলা হচ্ছে, পাকঅধিকৃত কাশ্মীর থেকে লস্কর-ই-তৈবা এই ঘটনা ঘটিয়েছে। যদি তাই-ই হয়, তবে সেই পাকঅধিকৃত কাশ্মীরই হোক ভারতীয় উপমহাদেশের গাজা ভূখণ্ড, নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হোক তাদের। কাপড় খুলে হিন্দু না মুসলিম নিশ্চিত হওয়ার বিষয়টি ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের সঙ্গে করেছিল। বেছে বেছে হিন্দুদের হত্যা করেছিল। পরিণামে পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশের সৃষ্টি হয়েছিল। এবার কি পাক অধিকৃত কাশ্মীরের ভারতভুক্তি ঘটবে? উপমহাদেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব কিন্তু ভারতকেই নিতে হবে।

মানুষ ইসলামি জঙ্গিমুক্ত উপমহাদেশ চায়। পাকিস্তান ও বাংলাদেশে ইসলামি জঙ্গিবাদের আঁতুড়ঘর ভারতকেই ভাঙতে হবে। এবং খুব শীঘ্রই।

প্রসঙ্গ দীঘার 'জগন্নাথ মন্দির'

বর্তমানে ভারতের সীমান্তে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি। আর এদিকে মালদহ- মুর্শিদাবাদ-নদীয়া জেলার হিন্দুরা জেহাদিদের হাতে ভয়াবহভাবে অত্যাচারিত। এরই ফাঁকে হিন্দুদের মূর্খ বানিয়ে তাঁদের ভোট নেওয়ার জন্য ওড়িশায় ভগবান জগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের থেকে আলাদা করে আরেকটি জগন্নাথ মন্দির তৈরি করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সরকারি খাতায় কলমে যদিও 'মন্দির' নয়,--- 'কালচারাল সাইট'। ধিক্কার জানাই এই রকম হিন্দুধর্মবিরোধী মুখ্যমন্ত্রীকে।

হিন্দুদের ভোট দিতে না দেওয়া দুধেল গাইদের দিয়ে মন্দির-দেব মূর্তি, প্যান্ডেল, এমনকী আরজি কর হাসপাতাল ভাঙা, হিন্দুহত্যা, হিন্দুদের উপর অবর্ণনীয় নির্যাতন হিন্দুদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি চুরি, ডাকাতি, লুঠতরাজ ও হিন্দু নারীদের যৌন নির্যাতন করা দুধেল সম্প্রদায়ের ইমাম ও মৌলবিদের ভাতা দেওয়া, 'মাদ্রাসা'-নামক ৬০০ নতুন টেররিস্ট ফ্যাক্টরি চালু, রাজ্যের সব মাদ্রাসাতে বছরে ৫ হাজার কোটি টাকা অনুদান, তাদের জন্য স্বাস্থ্যবীমা, হজ হাউস করে দেওয়া, হিন্দুদেরকে তাঁদের ভূমি থেকে উচ্ছেদ করে রোহিঙ্গা মুসলমানদের বসিয়ে দেওয়া— সবরকমের অপরাধ ও কুকীর্তি করার পর কি ভেবেছেন মুখ্যমন্ত্রী, হিন্দুরা আবারও পাতা ফাঁদে পা দেবে?

হ্যাঁ, অবশ্যই কিছু হিন্দু নামধারী, দ্বিচারী ব্যক্তি রয়েছে, যারা হয়তো জেনেশুনেই এই ফাঁদে ফের পা দেবে।

আপামর হিন্দুসমাজের মনে রাখা উচিত হিন্দুধর্মকে চূড়ান্ত অসম্মান করে 'গন্দা ধর্ম' আখ্যা দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী। তিনিই পূর্ণমহাকুম্ভ মেলাকে 'মৃত্যু কুম্ভ' বলেছিলেন। তার দলের সাংসদ সায়নী ঘোষ ও মহুয়া মৈত্র ভগবান শিব ও মা কালীর প্রতি অসম্মানজনক কথাবার্তা বলেছেন। তার দলের মন্ত্রী ববি হাকিম হিন্দুদের ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন। যারা আল্লার ইবাদত করেনি তাদের দুর্ভাগা বলেছেন। হুমায়ুন কবির হিন্দুদেরকে কেটে ভাগীরথীর জলে ভাসিয়ে দেবেন বলেছেন। ইসলামি জেহাদের এই সমস্ত পৃষ্ঠপোষকরা হিন্দুভোট নেওয়ার জন্য দীঘায় একজোট হয়েছে। হিন্দুদের ধোঁকা দেওয়ার জন্য ৪ দিন ধরে সেখানে 'মন্দির' উদ্বোধনের নাটক করে চলেছে। আজ ভোটের স্বার্থে এই ভোটভিখারীদের দল এই মন্দির বানাচ্ছে। কাল দুধেলদের জনসংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে। পরশু জেহাদিরা হিন্দু মন্দির ভাঙবে। তরশু ওটা মসজিদ হবে। হিন্দুদের নির্মূল করার উদ্দেশ্যে সন্ত্রাসবাদী তৈরির সেন্টার 'মাদ্রাসা' আর যেসব কিতাব পড়ে আতঙ্কবাদী তৈরি হয়, সেই সেন্টার আর জেহাদি কীভাবে নির্মূল করা যায়, সেটা নিয়ে কেউ চিন্তিত নয়। পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে এসেছে। সেকুলারিজম ত্যাগ না করলে হিন্দুরা নিজেদের জালে নিজেরাই জড়িয়ে যাবে। কিছু করার নেই।

—**দেবজ্যোতি পণ্ডিত,**
কাঞ্চনতার, মালদহ।

স্বস্তিকায় প্রকাশিত 'বিজেপির প্রারম্ভিক ইতিহাস' সম্পর্কে কিছু কথা

স্বস্তিকার ২৮ এপ্রিল, ২০২৫ (১৪ বৈশাখ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ) সংখ্যায় প্রণয় রায়ের তথ্যবহুল রচনা 'পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির প্রারম্ভিক ইতিহাস ও ক্রমবিকাশ : পর্ব-১' পড়লাম। শ্রীরায়ের লেখাটি এই প্রজন্মের বিজেপির কর্মী ও সমর্থকদের কাছে বিশেষ প্রয়োজনীয়। কিন্তু তথ্যবহুল এই রচনাটিতে দুটি ত্রুটি লক্ষ্য করা গেল। শ্রীরায় লিখেছেন, "দীনদয়াল উপাধ্যায় ১৯৫২ সালে কানপুরে 'ভারতীয় জনসঙ্ঘের' সর্বপ্রথম অধিবেশনে জনসঙ্ঘের সর্বপ্রথম সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক পদে মনোনীত হন।" কিন্তু এই তথ্যটি আংশিক সত্য। অখিল ভারতীয় জনসঙ্ঘের প্রথম অধিবেশন হয়েছিল ১৯৫১ সালের ২১ অক্টোবর, দিল্লিতে। এই অধিবেশনে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় জনসঙ্ঘের সর্বভারতীয় সভাপতি নির্বাচিত হন। তাঁরই সঙ্গে দলের প্রথম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন যথাক্রমে ড. ভাই মহাবীর ও মৌলীচন্দ্র শর্মা। পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় যদিও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, কিন্তু তিনি সর্বভারতীয় নয়, দলের উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। যদিও পরের বছর, ১৯৫২ সালে কানপুর অধিবেশনে তিনি দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

এছাড়াও আরেকটি বিভ্রাটও রয়েছে এই নিবন্ধটিতে। শ্রীরায় লিখেছেন, ১৯৫২-র নির্বাচনে দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায় মেদিনীপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হন। এটিও সঠিক তথ্য নয়। ওই নির্বাচনে মেদিনীপুর কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন ব্যারিস্টার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই নির্বাচনে জনসঙ্ঘ পশ্চিমবঙ্গ থেকে ৬ জনকে লোকসভায় প্রার্থী করা হয়, তার মধ্যে দু'জন নির্বাচিত হন। ওই নির্বাচনে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছাড়া জনসঙ্ঘের তৃতীয় জয়ী প্রার্থী হলেন রাজস্থানের চিতোর কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত উমাশঙ্কর মুলজীভাই ত্রিবেদী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৫২ সালের ওই সাধারণ নির্বাচনে মেদিনীপুর জেলা থেকে ৮ জন বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন। বাকি একজন অখণ্ড ২৪ পরগনা জেলা থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন। অত্যন্ত জনপ্রিয় নেতা ভারত কেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অকাল প্রয়াণ ছিল পশ্চিমবঙ্গে দলের সংগঠনের পক্ষে অপূরণীয় ক্ষতি। এই দুটি বিষয় সংশোধন করে নিলে রচনাটি অনেক প্রয়োজনে লাগবে বলে আশা করি।

—**বিনয়ভূষণ দাশ,**
কেয়াতলা, গোলপার্ক, কলকাতা- ২৯।

প্রকৃত মাতৃসাধনা কী?

বাঙ্গালির ঘরের মেয়ে উমা। বাঙ্গালি অধীর আগ্রহে পথ চেয়ে বসে থাকে আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের মহাসপ্তমী তিথির

ফঃ ৩

অপেক্ষায়। ঘরের মেয়ে দীর্ঘদিন বাদে ঘরে ফিরলে সকলে চারটে দিনের জন্য আত্মহারা হয়ে ওঠে। চারদিন পরে আবার বেজে ওঠে বিষাদের সানাই। ঘরের মেয়ের বিদায়ের পালা। আবারও একটা বছরের অপেক্ষা। সে যাই হোক, প্রতি বছর মায়ের আগমনই বাঙ্গালির পরম পাওয়া। আট থেকে আশি, সকলেরই মুখে ফুটে ওঠে এক চরম স্বস্তির হাসি, সকলেরই হৃদয় হয় আনন্দে আপ্লুত। মণ্ডপে মণ্ডপে সেজে ওঠে মাতৃপ্রতিমা, ঘরে ঘরে অতিথিদের আগমন প্রভৃতি মিলেমিশে এক আনন্দমুখর পরিবেশ সৃষ্টি হয় মহাসপ্তমী থেকে বিজয়া দশমীর দিনগুলিতে। কিন্তু শুধু কি মণ্ডপে মাতৃপ্রতিমা-কেন্দ্রিক আচার-অনুষ্ঠানকে ঘিরেই আমাদের মাতৃ-আরাধনা? আমরা মৃন্ময়ী মায়ের আরাধনায় মত্ত হই, কিন্তু ভুলে যাই সেই সব চিন্ময়ী মায়ের কথা যাঁরা বহু সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে কাটাচ্ছেন তাঁদের জীবন। আমরা আরাধনা করি শক্তিস্বরূপা ভগবতীর, কিন্তু ভুলে যাই সেই সব মায়ের কথা যাঁরা পশ্চিমবঙ্গেরই কোনো প্রান্তে আসুরিক শক্তির দ্বারা প্রতিনিয়ত নির্যাতিতা হচ্ছেন, পথের এককোণে মানুষের লাথি খেয়ে ভিক্ষা করছেন, চাপা পড়ছেন দুষ্টের অহংকারের রথের কণ্টকময় চাকার নীচে। শিকার হচ্ছেন কামাকৃষ্ট মানুষের নিকৃষ্ট নজরের। কী করে সার্থক হবে আমাদের মাতৃ আরাধনা? কোথাও একটা প্রশ্ন উঠে আসে না যে মায়েদের উপর কেন এত অত্যাচার? যে মায়ের সম্মানের স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিতা হয়ে পূজার বেদিতে উপবিষ্ট থাকার কথা, তাঁরাই নির্যাতিতা হচ্ছেন, আসুরিক শক্তির হাতে প্রাণ দিচ্ছেন, কিছু লালায়িত সারমেয়র ভোগের পাত্রী হচ্ছেন। বাঙ্গালির দ্বারা পূজিতা যে মাতৃমূর্তি বিশ্বকে শেখায় নারীরা অবলা নয়, শক্তিস্বরূপা, অসুরদলনী সেই মাতৃরূপের পূজা করে কী করে বহু মানুষের মনে কুচিন্তার সঞ্চার ঘটছে? তবে একটু ভেবে দেখুন সবাই যে আমরা কি মাতৃপূজা করছি? মৃন্ময়ী উমার আরাধনা করতে গিয়ে বাঙ্গালি চিন্ময়ী উমাকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে না তো? আমার মতে উত্তরটা হবে—'হ্যাঁ'। এই উত্তরের যথার্থতা যে কতটা পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পরিস্থিতিই তা প্রমাণ করে দেয়।

—**সুমন হোড়,** সালার, মুর্শিদাবাদ।

কাশ্মীর ও পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু নিধন

বর্তমান পৃথিবীতে মানব সভ্যতা নিজ প্রতিভায় বিকশিত হয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছে। বিলাসবহুল জীবন যাপনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা, চিকিৎসা, শিল্প-বাণিজ্য ও কৃষি উৎপাদনে উন্নয়ন শুধু নয়, মহাকাশেও তার জয়যাত্রা অব্যাহত রেখেছে মানবজাতি। অন্যদিকে সমাজ ব্যবস্থায় রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে গণতন্ত্রের জয়জয়কার হয়েছে। আইন-আদালতের মাধ্যমে পরিচালিত বিচার ব্যবস্থার দ্বারা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা হয়েছে। সবদিক থেকে মানব সভ্যতার ঘটেছে নব রূপায়ণ।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকের একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। একদিকে যেমন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অধীনে ছিল প্রায় সম্পূর্ণ বিশ্ব, তেমনই বিজ্ঞান বিরোধী, মানবতাবিরোধী কিছু একনায়কতান্ত্রিক মতবাদও এই সময় চরম শক্তি অর্জন করে। এই সব শক্তিকে প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রের চিন্তাশীল মানুষের মধ্যে এক অভূতপূর্ব সাংস্কৃতিক বন্ধন গড়ে ওঠে। সেই বন্ধনের মধ্যে ঐক্য সঞ্চারী সূত্রটি ছিল প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞানমুখী, মানবিক সংস্কৃতি। আইনস্টাইনের মতো বিজ্ঞানী, রোম্যাঁ রোলাঁর মতো চিন্তাবিদ, রবীন্দ্রনাথের মতো বিশ্বকবি, পিকাসোর মতো চিত্রশিল্পী--- এঁরা সকলেই একজোট হয়েছিলেন বিশ্বব্যাপী শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারে।

অন্যদিকে বর্তমান বিশ্বে রাষ্ট্রনেতাদের আন্তর্জাতিক স্তরের সম্মেলনের আলোচনা সূচিতে সন্ত্রাসবাদের উপস্থিতি অনিবার্য। সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষ, যেমন— শিক্ষক, গবেষক, প্রশাসক, নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ, আইনজীবী, রাজনীতিবিদ, মনস্তত্ত্ববিদ ইত্যাদি সকলেই বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। অনুপুঙ্খ দৃষ্টিতে তাকালে দেখা যাবে, সন্ত্রাসবাদের বাড়বাড়ন্তের ফলে সাধারণ মানুষ, বিশেষত হিন্দুদের জীবন, সম্পত্তির অধিকারের সীমা যেন সংকুচিত হয়েছে।

ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের ইতিহাস অধ্যয়ন করলে আমরা দেখব শত শত বিপ্লবীদের আত্মবলিদান এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আজাদি সেনাদের সংগ্রামের দরুন ব্রিটিশ শাসনের অবসান হয়েছে। ভারতে রয়েছে ভৌগোলিক বৈচিত্র্য। এই দেশে রয়েছে পাহাড়-পর্বত, মালভূমি, সমভূমি, মরুভূমি, সাগর ও মহাসাগরের বৈচিত্র্যময় মিলন। অন্যদিকে এই দেশের মধ্যে বহু জাতি ও বহু বর্ণের মিলন সাধিত হয়েছে। এই মহান মিলনক্ষেত্রটিকে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে, ডাইরেক্ট অ্যাকশনের দ্বারা হিন্দু নিধনের মাধ্যমে খণ্ডিত করা হয়েছে। ১৯৪৭ সালে একটি খণ্ডিত স্বাধীনতা লাভ করেছে ভারত। শুধু তাই নয়, স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে পূর্ণ গণতান্ত্রিক আদর্শ-সমন্বিত স্বাধীনতা ভারত পায়নি। স্বাধীন দেশেও বহু বছর ধরে 'এক নিশান, এক বিধান, এক প্রধান' ব্যবস্থা ছিল না। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ঐকান্তিক চেষ্টায় ভারতীয় সংবিধানের ৩৭০ ধারা বাতিলের মাধ্যমে 'এক নিশান এক বিধান এক প্রধান' ব্যবস্থা অর্জিত হয়েছে।

বর্তমানে শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার ক্ষমতায় এসেছে। দেশের সর্বস্তরে উন্নয়ন পরিলক্ষিত হচ্ছে। জনগণের আয়ও বেড়েছে। এমতাবস্থায় পাকিস্তানপন্থী, ঈর্ষান্বিতরা পুনরায় সক্রিয় হয়ে উঠেছে। কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে ভূস্বর্গের অনাবিল সৌন্দর্যপূর্ণ স্থানে নিরীহ পর্যটকদের মধ্যে বেছে বেছে ২৬ জন হিন্দু যুবককে হত্যা করেছে সন্ত্রাসবাদীরা। শুধু ভারতে নয়, সারা বিশ্বে এই ধরনের সন্ত্রাসবাদী হামলায় আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। মালদহ ও মুর্শিদাবাদেও সম্প্রতি অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে। সেখানেও সংঘটিত হয়েছে হিন্দুহত্যা। হিন্দুদের সম্পত্তি লুণ্ঠতরাজ, বাড়ি ও দোকানঘরে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। হিন্দু নারীদের সম্ভ্রমহানি করা হয়েছে। মানব সভ্যতার ইতিহাসে এ এক নির্মম পরিহাস।

—**রবীন্দ্রনাথ রায়,**
রাশিডাঙ্গা-২, কোচবিহার।

উপকারী উচ্ছের রকমারি রান্না

সুতপা বসাক ভড়

আমাদের দেশের পরম্পরা খুবই বিজ্ঞানসম্মত। স্বাভাবিকভাবেই রান্নাঘরেও তার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। সারা বছর ধরে, বিশেষ করে গ্রীষ্মের প্রখর দাবদাহে উচ্ছে বা করলা আমাদের খাদ্যতালিকার প্রথম দিকেই স্থান পায়। বর্তমানে, সমাজে মধুমেহ একটি গুরুতর ব্যধিরূপে চিহ্নিত হয়েছে। সেক্ষেত্রে উচ্ছে নিদেনপক্ষে করলা দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় থাকা বাঞ্ছনীয়, এমনটাই মনে করেন পুষ্টিবিদেরা। তবে অনেকে উচ্ছের একঘেয়েমিতে হাঁপিয়ে ওঠেন। সেক্ষেত্রে বাঙ্গালি ঘরে নিত্যপ্রয়োজনীয় কিছু রান্নার পদ স্মরণ করা যেতে পারে। সেই রন্ধনপদ্ধতি খুবই সহজ।

গ্রাম অথবা শহর যে কোনো জায়গাতে মাত্র একহাত দৈর্ঘ্য-প্রস্থ মাটি কিংবা ১০/১২ ইঞ্চির টবে পাকা উচ্ছে বা করলার বীজ শুকিয়ে পুঁতে দিলে কয়েকদিনের মধ্যেই চারা বেরিয়ে আসে এবং এক মাসের মধ্যে ফুল, দু-মাস পরে উচ্ছে/করলা ধরে যায়। সার হিসেবে গোবর সার, কেঁচো সার, নিমের খোল, চা-পাতা ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে। একথা অনস্বীকার্য, নিজের হাতে লাগানো গাছ থেকে যে সবজি পাওয়া যায়, তার স্বাদ এবং গুণমান উভয়ই উচ্চমানের হয়ে থাকে।

উচ্ছে ও করলার মধ্যে সাধারণত উচ্ছের স্বাদ এবং উপকারিতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে, তবে উচ্ছের পরিবর্তে করলাও ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রথমে আসি, অতি সহজ পদ্ধতিতে **উচ্ছে সেদ্ধর** কথা। ভাত করার সময় চাল ও উচ্ছে একসঙ্গে হাঁড়িতে সেদ্ধ করে নেওয়া যায়। উচ্ছেগুলি একটি কাপড়ের পুঁটলি করে দিলে বের করার সময় সুবিধা হয়। সেদ্ধ উচ্ছেগুলি— নুন, কাঁচালঙ্কা, কাঁচা সরষের তেল অথবা ঘি দিয়ে মেখে একসঙ্গে মেখে খেতে অনেকে ভালোবাসেন। আবার কড়াইতে সরষের তেলে কালো জিরে, কাঁচালঙ্কা ফোড়ন দিয়ে পাতলা পাতলা করে উচ্ছে ও সামান্য হলুদ ও নুন দিয়ে ধিমে আঁচে নাড়াচাড়া করে নিলে খুব সুস্বাদু হয়। এক্ষেত্রে উচ্ছের সঙ্গে সামান্য আলুও দেওয়া যেতে পারে। সেদ্ধ বা ভাজার সঙ্গে কাসুন্দি মিশিয়ে ভাতের সঙ্গে খেতেও ভালো লাগে।

উচ্ছেবটির জন্য সমপরিমাণ উচ্ছে, বেগুন, কুমড়ো, আলু কেটে নিতে হবে। কড়াইতে সরষের তেলে কালোজিরে, কাঁচালঙ্কা ফোড়ন দিয়ে প্রথমে উচ্ছে, তারপর বাকি সবজি দিয়ে সামান্য হলুদ ও নুন দিয়ে কম আঁচে ঢাকা দিয়ে রান্না করতে হবে। সবজি নরম হলে সামান্য মিষ্টি দিয়ে নামিয়ে নিতে হবে।

উচ্ছে পোস্তর জন্য ছোটো করে উচ্ছে কেটে নিতে হবে। কড়াইতে সরষের তেলে শুকনো লঙ্কা, কালোজিরে ফোড়ন দিয়ে উচ্ছে দিতে হবে। নুন দিয়ে ঢাকা দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে একটু নরম হয়ে এলে পোস্তবাটা দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিলে উচ্ছে পোস্ত তৈরি। এইভাবে পোস্তর পরিবর্তে সর্ষেবাটা দিলে **উচ্ছে সর্ষে** হবে। এই দুটি পদে একই সর্ষের তেল মিশিয়ে নিলে স্বাদ কয়েকগুণ বেড়ে যায়।

উচ্ছে মটরডাল খেতে সবাই ভালোবাসি। প্রথমে একটু নুন দিয়ে ভালো করে সেদ্ধ করে নিতে হবে। এবার উচ্ছেগুলো পাতলা-পাতলা করে কেটে কড়াইতে সর্ষের তেলে উচ্ছে ভেজে তুলে নিতে হবে। তারপর মৌরি, তেজপাতা শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে ডাল দিতে হবে। ফুটে উঠলে একটু আদা মৌরিবাটা ও সামান্য মিষ্টি দিয়ে, যে পাশে উচ্ছে ভেজে রাখা আছে, তার ওপর ঢেলে দিতে হবে। এর সঙ্গে এক চামচ ঘি দিলে তো একথালা ভাত খেয়ে নেওয়া যায়।

এবার আসি **উচ্ছে সুক্তো** প্রসঙ্গে। এজন্য উচ্ছে, আলু, বেগুন, পটোল, কুমড়ো, কাঁচকলা, সজনে ডাঁটা— যা যা সবজি বাড়িতে আছে সেগুলি সমপরিমাণে নিয়ে লম্বা করে কেটে নিতে হবে। কড়াইতে সর্ষের তেলে কয়েকটা বড়ি ভেজে তুলে নিতে হবে। এবার পাঁচফোড়ন, কাঁচালঙ্কা, তেজপাতা ফোড়ন দিয়ে প্রথমে উচ্ছে তারপর বাকি সবজি নুন দিয়ে একটু নেড়েচেড়ে নিতে হবে। পরিমাণ মতো জল দিয়ে কম আঁচে রাখতে হবে। সবজি নরম হলে ভেজে রাখা বড়ি, দু-হাতা দুধ, আদাবাটা, জিরেবাটা, সামান্য মিষ্টি দিয়ে ভালো করে ফুটিয়ে নিতে হবে, পরিবেশনের পাত্রে ঢেলে একটু ঘি দিলেই তৈরি উচ্ছের সুক্তো।

উচ্ছেপাতার বড়া : বাড়িতে উচ্ছের লতা থাকলে, সেখান থেকে কয়েকটি পাতা তুলে নিয়ে ধুয়ে নিয়ে রাখতে হবে। নুন, আদাবাটা, কাঁচালঙ্কা, কালোজিরে, বেসন দিয়ে ভালো করে ফেটিয়ে ওই পাতাগুলি কুচিয়ে কিংবা গোটা পাতা বেসনে ডুবিয়ে ভেজে গরম ভাতে খুব ভালো লাগে।

এগুলি বাঙ্গালির রান্নাঘরে বহুল প্রচলিত। আয়ুর্বেদে উচ্ছের গুণাবলী সম্পর্কে উচ্চমত পোষণ করা হয়েছে। এরকম খাবার গ্রহণ করলে আমরা অনেক অসুখ এবং অপ্রয়োজনীয় ওষুধ গ্রহণ থেকে মুক্তি পেতে পারি।

শরীরে সোডিয়াম কমে গেলে হতে পারে সমস্যা

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

মানবশরীরের একটি অন্যতম প্রয়োজনীয় ইলেকট্রোলাইট— সোডিয়াম। রক্তে সোডিয়ামের মাত্রা বাড়াও যেমন শরীরের পক্ষে খারাপ; তেমনি এর মাত্রা কমে গেলেও শরীরের নানাবিধ ক্ষতি হতে পারে। সাধারণত যদি দেখা যায় কোনো রোগী বমি করার পরে ক্রমশ ঝিমিয়ে পড়ছে, অসংলগ্ন কথাবার্তা বলছে, এমনকী অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে,তা সেগুলি সোডিয়াম কমে যাওয়ারই লক্ষণ। সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে রোগীকে। তখন ইন্ট্রাভেনাস মানে হাতের শিরার মাধ্যমে রোগীকে সোডিয়াম দিলে খানিকক্ষণ পরে রোগী সুস্থ বোধ করেন। এর পরে আবারও ইলেকট্রোলাইটস্ পরীক্ষা করে যদি দেখা যায় রোগীর রক্তে সোডিয়াম স্বাভাবিক লেভেলে এসেছে তাহলে রোগীকে ছেড়ে দেওয়া হয়। ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, ম্যাগনেসিয়ামের মতো সোডিয়ামও মানবশরীরের একটি গুরুত্বপূর্ণ খনিজ লবণ। এটি স্নায়ুর উপরে প্রভাব ফেলে বলে এটি কমে গেলে নানারকমের জটিলতার সৃষ্টি হয়।

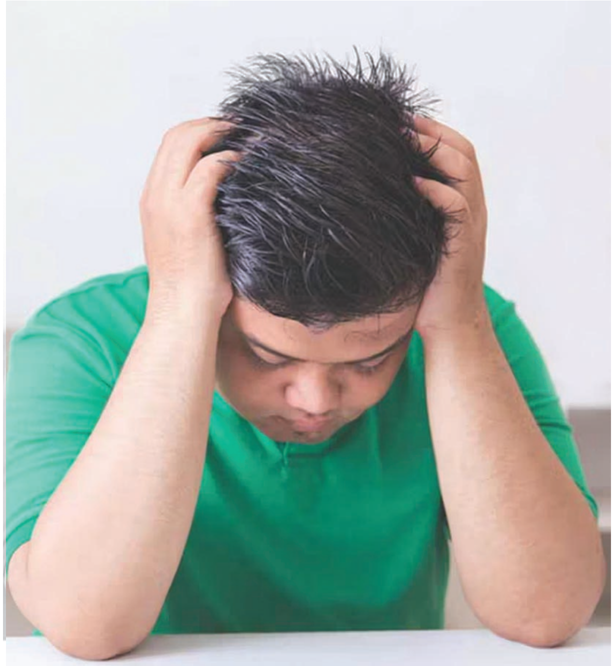

কেন হয় সোডিয়ামের ঘাটতি?

একটানা কয়েকদিন ডায়ারিয়া হলে যদি ডিহাইড্রেশনের সমস্যা হয়, তাহলে ইলেকট্রোলাইট্ ইমব্যালেন্স হয়ে সোডিয়ামের ঘাটতি হতে পারে। ক্রমাগত বমি করতে থাকলে রোগীর শরীরে সোডিয়ামের ঘাটতি হয়। আগুনে চামড়া পুড়ে যাওয়া থেকেও এই গুরুত্বপূর্ণ মিনারেলটির ঘাটতি হতে পারে। ডাই ইউরেটিক্স জাতীয় ওষুধ, মানসিক সমস্যার ওষুধ থেকেও সোডিয়ামের ঘাটতি হয়। অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি ঠিকমতো কাজ না করলে তার ফলাফল হয় সোডিয়াম ঘাটতি। হাইপোথাইরয়েডিজমও অনেক সময়ে এর কারণ হয়। কিডনি, লিভার ও হার্টের জটিলতা অনেক সময়ে সোডিয়াম ঘাটতির মাধ্যমে প্রকাশ পায়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত জলপান করলে সোডিয়ামের ঘাটতি হয়। শিরার মাধ্যমে ইলেকট্রোলাইটস্ ফ্রি স্যালাইন অতিরিক্ত নিলেও সোডিয়ামের ঘাটতি হয়ে থাকে।

কোন কোন উপসর্গ দেখে বুঝবেন

উপসর্গ নির্ভর করে সোডিয়াম কতক্ষণের মধ্যে কমেছে ও কতটা বেশি কমেছে, তার উপর। যদি ২৪-৪৮ ঘণ্টার মধ্যে কমে আর সেটা যদি ১২৫ মিলিমোলের নীচে নেমে যায় তাহলে তার একাধিক জটিল উপসর্গ থাকে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরিভাষায় একে অ্যাকিউট হাইপোন্যাট্রিমিয়া বলে। এক্ষেত্রে দ্রুত চিকিৎসা শুরু না করলে রোগীর অবস্থার অবনতি হতে পারে। ৪৮ ঘণ্টার বেশি সময় ধরে হলে এটি ক্রমিক। এক্ষেত্রে উপসর্গ না-ও থাকতে পারে। সোডিয়াম কমে গেলে প্রধান যে সমস্যা হয়, তা হলো জ্ঞানের মাত্রার তারতম্য হওয়া।

এছাড়াও রোগীর যেসকল উপসর্গ থাকে, সেগুলির মধ্যে প্রধান হলো বমি বমি ভাব, বমি করে ফেলা, মাথাব্যথা, রোগীর ক্রমশ ঝিমিয়ে পড়া, অসংলগ্ন কথাবার্তা বলা, খিঁচুনি, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া, আচমকা হার্ট বন্ধ হয়ে যাওয়া ইত্যাদি।

চিকিৎসা

রোগীর যদি চেতনার মাত্রা কমে যায়, তাহলে কালক্ষেপ না করে নিকটবর্তী হাসপাতালের এমারজেন্সিতে নিয়ে যেতে হবে। সোডিয়ামের মাত্রা বেশি কমে গেলে ইন্ট্রাভেনাস পথে স্যালাইন দিয়ে সেই ঘাটতি মেটানোর চেষ্টা করা হয়। রোগীর আগে থেকে কী কী অসুখ ছিল, কী কী ওষুধ খাচ্ছে, এক কথায় পুরো মেডিক্যাল হিস্ট্রি চিকিৎসককে জানাতে হবে।

ডায়ারিয়া বা বমি হলে স্যালাইন জল খেতে হবে। কোনো রোগীর যদি বারে বারে সোডিয়ামের ঘাটতি হয়, তাহলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে দেখতে হবে এর পিছনে অন্য কোনো রোগ আছে কি না। □

ভূস্বর্গের সবুজ গালিচায় রক্তের প্লাবন

মণীন্দ্রনাথ সাহা

ভয়ংকর জঙ্গি হানায় রক্তাক্ত হলো ভূস্বর্গ কাশ্মীর। গত ২২ এপ্রিল দুপুরে কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হানার ঘটনায় ২৬ জন পর্যটকের মৃত্যু হয়েছে। আহতের সংখ্যা ১৭। তবে হতাহতের সংখ্যা বাড়তে পারে। জঙ্গিরা যেভাবে হত্যালীলা চালিয়েছে তা শিউরে ওঠার মতো। বেছে বেছে হিন্দু পর্যটকদের খুন করা হয়েছে কাশ্মীরে। হিন্দু পরিচয় জেনেই ঝাঁঝরা করা হয়েছে গুলিতে। অথচ সেখানেই মৃত্যুর মুখে জোরে জোরে কমিউনিস্ট অধ্যাপক কলমা পড়তে থাকায় তিনি সমেত তার পরিবারের তিনটি প্রাণ বেঁচে যায়।

জানা গিয়েছে, পহেলগাঁওয়ের পাহাড়ে একটি রিসর্টের অদূরে জঙ্গি হামলা হয়। পর্যটকরা যখন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করছিলেন তখন হঠাৎ সশস্ত্র জঙ্গিরা পর্যটকদের জনে জনে ধর্ম জিজ্ঞাসা করে গুলি করে। বেছে বেছে হিন্দুদের গুলি করেছে জঙ্গিরা। এটা একটা নজিরবিহীন ঘটনা বলেই মনে করছে সব মহল।

ঘটনার পরেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নির্দেশে পহেলগাঁওয়ে পৌঁছেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। প্রধানমন্ত্রী ঘটনার তীব্র নিন্দা করে এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'এই হামলার সঙ্গে যুক্ত কাউকে ছাড়া হবে না।' তিনি আরও লিখেছেন, 'জম্মু-কাশ্মীরে জঙ্গি হানার তীব্র নিন্দা করছি। যাঁরা প্রিয়জনকে হারালেন, তাঁদের সমবেদনা জানাই। আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করি। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড জড়িতদের কাউকে ছাড়া হবে না। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই আরও শক্তিশালী হবে।'

জম্মু-কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা বলেছেন, 'এই হামলায় যুক্ত কাউকে ছাড়া হবে না।'

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ঘটনার নিন্দা করে বলেছেন, 'নিরাপরাধ নাগরিকদের ওপর এই ধরনের হামলা নিন্দনীয় ও ক্ষমার অযোগ্য।' লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা, কেন্দ্রীয় পর্যটনমন্ত্রী গজেন্দ্র সিংহ শেখাওয়াত, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহ, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী প্রমুখ প্রত্যেকেই ঘটনার নিন্দা করেছেন। নিন্দা করেছেন, জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী আব্দুল্লাও। তিনি বলেছেন, 'এই কাপুরুষের মতো কাজ মেনে নেওয়া যায় না। নিরীহ পর্যটকদের ওপর হামলা করা হয়েছে। অপরাধীরা পশু। আহত ও নিহতদের পরিবারের সদস্যদের সমবেদনা জানাই।'

জঙ্গি হানার খবর পাওয়ার পরই ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছে সেনা এবং জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ। জঙ্গিদের খোঁজে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে চিরুনি তল্লাশি চলছে। জানা গিয়েছে, হাফিজ সঈদের লস্কর-ই-তৈবার ছায়া সংগঠন 'দ্যা রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট' (টিআরএফ)-তেই হামলা চালায়। জঙ্গিরা অন্ততপক্ষে ৫০ রাউন্ড গুলি চালিয়েছে।

পহেলগাঁওয়ে হিন্দু হত্যায় নারকীয় উল্লাস করে লস্কর ও পাকিস্তানকে ধন্যবাদ জানিয়ে গ্রেপ্তার হয়েছে ঝাড়খণ্ডের মৌলভি মহম্মদ নৌসাদ। নৌসাদ বিহারের এক মাদ্রাসা থেকে কোরানের ওপর ডিগ্রিধারী। মৌলভি তার মনের কথা জনসমক্ষে বলে ফেলেছে। এমন হাজার হাজার মৌলভি আমাদের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, যাদের

কাছে 'একই বৃন্তের দুটি কুসুম' কিংবা সাম্প্রতিক সম্প্রীতির কোনো মূল্য নেই। যাদের কাছে ভারতীয় পরিচয়ের থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মজহবি পরিচয়। এদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে শুধুই ঘৃণা আর বিদ্বেষ।

এই মৌলভির মানসিকতাকে সামনে রেখে অনেকেই বলছেন— 'অন্য রাজ্যের হিন্দুদের কাশ্মীর ভ্রমণে যাওয়া উচিত নয়। কাশ্মীর ছাড়াও দেশে বহু দৃষ্টিনন্দন জায়গা রয়েছে, সেসব জায়গা ঘুরে দেখা উচিত। মাত্র তিনটি বছর কাশ্মীর বয়কট করলে দেখা যাবে কাশ্মীরিদের কী হাল হয়। এছাড়া দেশের যে কোনো রাজ্যে ব্যবসা করতে আসা কাশ্মীরি মুসলমানদের কাছ থেকে কোনো জিনিস কেনা ঠিক হবে না। কেননা কাশ্মীরিদের সহযোগিতা ছাড়া অন্য দেশ থেকে এসে ওভাবে হামলা করা সম্ভব নয়। উপরন্তু ওরা যে জঙ্গিদের মদতদাতা নয় তা কী করে জানা যাবে। সুতরাং জঙ্গিদের মদতদাতা কাশ্মীরিদের সবক শেখানো সকলের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।'

পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার খবরে তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে পাকিস্তানে। বিশেষ করে রাওয়ালপিণ্ডিতে। হামলার পর ভারতজুড়ে আবার একটা সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের দাবি উঠতে শুরু করেছে। কেউ কেউ বলছেন, পাকিস্তান হামাসের মতো হামলা করেছে। ভারতের উচিত ইজরায়েলের মতো জবাব দেওয়া। পাক সেনার আশঙ্কা, পহেলগাঁওয়ের পরেও ভারত যে প্রত্যাঘাত করবে, তা অনির্বার্য। তবে ভারতের সেই পালটা মার কবে, কোথায় ও কীভাবে আছড়ে পড়বে, তা নিয়ে দিশেহারা পাক সেনাকর্তারা। সে আশঙ্কায় পাক ফৌজের মধ্যে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠেছে। যে দেশ প্রতিনিয়ত আতঙ্কবাদীদের আশ্রয়দাতা, সেদেশ সন্ত্রাসীদের মদত দিয়ে এসেছে চিরকাল, তারা এখন নিজেরাই আতঙ্কিত।

২০১৯ সালে পুলওয়ামায় সেনা কনভয়ে জঙ্গি হামলায় ৪০ জওয়ানের হত্যার প্রত্যাঘাত হিসেবে পাক অধিকৃত কাশ্মীরে ঢুকে বালাকোটে গজিয়ে ওঠা জয়েশ-ই-মহম্মদ গোষ্ঠীর তিনটি জঙ্গি শিবিরে মুহুর্মুহু বোমাবর্ষণ করে ভারতীয় বায়ুসেনার মিরাজ যুদ্ধ বিমানগুলি। সেই অভিযানে পাকিস্তান কিছু বুঝে ওঠার আগেই খতম হয়েছিল ৩২৫ জঙ্গি।

পাকিস্তান এখন সবচেয়ে বড়ো সমস্যায় পড়েছে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ে। পহেলগাঁও হামলার জেরে ভারতের পাশে দাঁড়িয়েছে বিশ্বের বড়ো বড়ো দেশগুলো। শুধু পাশে থেকে সমবেদনা জানানোই নয়, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারতকে পূর্ণ সমর্থনের আশ্বাস দিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, সৌদি আরব, ইজরায়েল ও রাশিয়া। ফলে ভারত প্রত্যাঘাত করলেও কেউ তার বিরুদ্ধচারণ করবে না।

এদিকে, ভারতের জনমানসে পাকিস্তানে প্রত্যাঘাতের দাবি উঠছে। জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের প্রাক্তন ডিজি এমপি বৈদ্য পহেলগাঁও হামলাকে 'ভারতের জন্য পুলওয়ামার দ্বিতীয় মুহূর্ত' বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে এটি একটি সুপরিকল্পিত আক্রমণ। হামলাকারীরা আসলে পাকিস্তান স্পেশাল সার্ভিস গ্রুপ (এসএসজি)- এর কমান্ডো ছিল। আমি বিশ্বাস করি যে এটি ভারতের জন্য পুলওয়ামার দ্বিতীয় মুহূর্ত। এটি কোনো কাকতালীয় ঘটনা নয়। এটি একটি সুপরিকল্পিত আক্রমণ। ...হামাসের হামলার পর ইজরায়েল যা করেছিল তার মতোই প্রতিক্রিয়া হওয়া উচিত। উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া হওয়া উচিত।'

ভারতের সেকু-মাকুরা কথায় কথায় বলেন, সন্ত্রাসের কোনো ধর্ম হয় না। কিন্তু এই সন্ত্রাসীরা তো ধর্ম জেনে তবেই হত্যা করেছে। তারা কিন্তু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, তপশিলি, তামিল, তেলুগু, বাঙ্গালি বা কমিউনিস্ট কিংবা সেকুলার জিজ্ঞাসা করেনি। তারা জিজ্ঞাসা করে শুধু হত্যা করেছে হিন্দুদেরকে। তারা এমনকী তারা গোপনাঙ্গ দেখে নিশ্চিত হয়ে হত্যা করেছে। ঠিক যেমন ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পাকিস্তানের সেনারা হিন্দুদের সঙ্গে করেছিল।

পঞ্চদশ কোর সেনা ব্যাটেলিয়ানের প্রধান মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লাকে জম্মু-কাশ্মীরের পুলিশ প্রধানকে সরাতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। আব্দুল্লা তা উপেক্ষা করেছিলেন। আর আজ নিরীহ হিন্দু পর্যটকরা সেই উপেক্ষার মূল্য চোকালেন।

১৯৯০ সালে ওমরের পিতা ফারুকের নির্দেশে ছয় লক্ষ কাশ্মীরি হিন্দু পণ্ডিতকে কাশ্মীর ছাড়তে বাধ্য করেছিল জেহাদিরা। এই আব্দুল্লা পরিবারকে আর কতদিন সহ্য করবে দেশবাসী? কতদিন সহ্য করবে মেহবুবা এবং অন্যান্য দেশ ও জাতি বিদ্বেষীদের? জম্মু-কাশ্মীরে জঙ্গি হামলা স্থানীয় লোকদের সমর্থন ছাড়া কখনোই সম্ভব নয়। কাশ্মীর থেকে ধুলিয়ান, হিন্দু গণহত্যার ছক জেহাদিদের। দুদিন আগেও যে লোকটার কাছে ফল কিনতেন, মাছ, মাংস কিনতেন, সবজি কিনতেন, সে আজ এসে আপনাকে কুপিয়ে দিয়ে চলে যেতেই পারে। তাই হিন্দুদের সতর্ক থাকতে হবে, প্রতিবেশীদেরও সতর্ক করতে হবে।

ভারত সরকারের এবার সময় হয়েছে পাকিস্তানের এই জঙ্গিপনা ও জঙ্গিদের মদত দেওয়ার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার।

পহেলগাঁওয়ে সন্ত্রাসবাদী হামলায় নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা।

পহেলগাঁও হত্যাকাণ্ডের প্রত্যুত্তরে ভারতের সামনে কী কী সামরিক বিকল্প রয়েছে?

কর্নেল (ড.) কুণাল ভট্টাচার্য

ভারতের ইতিহাসে গত ২২ এপ্রিল, ২০২৫ দিনটি ভারতের ইতিহাসে, ভারতবাসীর স্মৃতিতে চিরকাল রক্তাক্ষরে লেখা থাকবে। বহু বছর ধরে পাক সন্ত্রাসের বলি হয়ে চলেছে সাধারণ ভারতীয় নাগরিক ও ভারতীয় সেনা। গত ২২ এপ্রিল কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে পাক মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা ঠাণ্ডা মাথায় সংঘটিত নিরীহ হিন্দু পর্যটকদের হত্যাকাণ্ড ভারতের ধৈর্যের সব বাঁধ ভেঙে দিয়েছে। সহ্যের সব সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে সন্ত্রাসবাদী দেশ পাকিস্তান। এই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষিতেই আজ এই নিবন্ধের অবতারণা। গণহত্যার প্রায় এক সপ্তাহ পর প্রাথমিক ক্ষোভ ও শোক কিছুটা নির্বাপিত। শোকের স্থান অধিকার করেছে হত্যাকারী এবং এই পরিকল্পিত গণহত্যার মূল চক্রীদের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার দৃঢ় সংকল্প। ঘটনার পর সৌদি আরব সফর কাটছাঁট করে দেশে ফেরেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গত ২৪ এপ্রিল বিহারে একটি প্রকাশ্য জনসভায় দাঁড়িয়ে এই সন্ত্রাসবাদী হানার প্রতিশোধ নেওয়ার অঙ্গীকার করেন তিনি।

জম্মু-কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে ইসলামি সন্ত্রাসবাদীদের নৃশংস হামলায় ভূস্বর্গে ভ্রমণরত ২৬ জন হিন্দু পর্যটক নিহত হওয়ার পর সন্ত্রাসবাদের জন্মদাতা ও মদতদাতা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একের পর এক কূটনৈতিক ও কৌশলগত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে ভারত। ১৯৮৯ থেকে ভারতের বিরুদ্ধে ক্রস-বর্ডার টেররিজম বা আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাসবাদে ব্যাপকভাবে মদত দিয়ে আসছে পাকিস্তানি সরকার ও সেনাবাহিনী। তাদের এই কার্যকলাপের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরেই সরব রয়েছে ভারত। কাশ্মীরের বৈসরন উপত্যকায় সাম্প্রতিক এই জঙ্গি হামলার দায় স্বীকার করেছে 'দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট' নামক পাক সন্ত্রাসবাদী সংগঠন লস্কর-ই-তৈবার একটি শাখা।

সন্ত্রাসবাদী হামলার ঠিক পরেই ১৯৬০ সালের স্বাক্ষরিত সিন্ধু জলচুক্তি রদ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে ভারত। ভারতে সন্ত্রাস রপ্তানি পাকিস্তান পুরোপুরি বন্ধ না করা পর্যন্ত এই চুক্তি স্থগিত থাকবে বলে জানিয়েছে নয়াদিল্লি। কাশ্মীরে হামলার পরের দিন, অর্থাৎ গত ২৩ এপ্রিল ভারত সরকারের নিরাপত্তা বিষয়ক ক্যাবিনেট কমিটি (ক্যাবিনেট কমিটি অন সিকিউরিটি)-র বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করেছে ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রক :

(১) আটারিতে ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট (সমন্বিত সীমান্ত চৌকি) বন্ধ থাকবে বলে ঘোষণা করেছে ভারত সরকার। সীমান্তের দু'দিক থেকে এই চেকপোস্ট দিয়ে যানবাহন চলাচল এবং দু'দেশের নাগরিকদের যাতায়াত বন্ধ থাকবে বলে জানিয়েছে ভারত। ভারতীয় নাগরিক যারা ভিসা বা বৈধ অনুমোদনের মাধ্যমে সীমান্ত পেরিয়ে পাকিস্তানে গিয়েছেন তাদেরকে মে মাসের ১ তারিখের মধ্যে দেশে ফিরে আসার ব্যাপারে জানায় ভারত

সরকার। যে পাকিস্তানি নাগরিকরা ভিসা নিয়ে ভারতে এসে রয়েছেন, তাদেরকেও ভারত ত্যাগের জন্য ১ মে পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়।

(২) **পাকিস্তানের ক্ষেত্রে সার্ক ভিসা এক্সেম্পশন বাতিল :** সার্ক গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির নাগরিকদের জন্য ভারতীয় ভিসা দানের ক্ষেত্রে কিছু অতিরিক্ত সুযোগসুবিধা ছিল। সন্ত্রাসবাদী হামলার প্রেক্ষিতে পাকিস্তানি নাগরিকদের জন্য সার্ক ভিসা এক্সেম্পশন স্কিম (এসভিইএস) প্রত্যাহার করেছে ভারত। এই প্রকল্পের অধীনে প্রদত্ত ভিসাগুলি বাতিল করে ভারত সরকার। ভিসা বাতিলের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে এই ভিসা নিয়ে ভারতে থাকা পাকিস্তানি নাগরিকদের ভারত ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

(৩) **পাক সামরিক উপদেষ্টাদের অবাঞ্ছিত ঘোষণা :** নয়াদিল্লিতে অবস্থিত পাকিস্তানি হাইকমিশনের প্রতিরক্ষা, নৌ ও বিমান উপদেষ্টাদের 'পার্সোনা নন গ্র্যাটা' বা অবাঞ্ছিত বলে ঘোষণা করে ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রক। ভারত ত্যাগের জন্য তাদের এক সপ্তাহ সময় দেওয়া হয়। ইসলামাবাদে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাসে কর্মরত ভারতীয় প্রতিরক্ষা উপদেষ্টাদের প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তও ঘোষণা করে ভারত সরকার।

(৪) **কূটনীতিকদের সংখ্যা হ্রাস :** পারস্পরিক ক্ষেত্রে কূটনীতিকদের সংখ্যা কমিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেয় ভারত সরকার। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গত ১ মে-র মধ্যে ভারতীয় ও পাকিস্তানি— উভয় হাইকমিশনে কর্মরত কূটনীতিকদের সংখ্যা ৫৫ থেকে কমিয়ে ৩০-এ আনা হবে।

(৫) **পাকিস্তানি নাগরিকদের জন্য সকল ভিসা পরিষেবা স্থগিতকরণ :** কাশ্মীরে এত বড়ো মাপের সন্ত্রাসবাদী হামলার পরই পাকিস্তানি নাগরিকদের জন্য সমস্ত ভিসা পরিষেবা স্থগিত করে দেয় ভারত সরকার। ২৭ এপ্রিলের মধ্যে ভারতে অবস্থানকারী সমস্ত পাকিস্তানি নাগরিককে ভারত ত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়। সরকারি নির্দেশে বলা হয় যে, মেডিক্যাল ভিসাধারী পাক নাগরিকরা ২৯ এপ্রিল পর্যন্ত থাকতে পারবেন। তারপর তাদের পাকিস্তানে ফিরতে হবে।

(৬) **আটারিতে সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর রিট্রিট অনুষ্ঠান ও প্রদর্শনী হবে সংক্ষিপ্ত :** পঞ্জাবের আটারি, হুসেইনিওয়ালা ও সাদকিতে তাদের রিট্রিট প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান কাটছাঁট করছে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী (বিএসএফ)। দু'দেশের সীমান্ত রক্ষীদের মধ্যে প্রতীকী করমর্দন বন্ধ থাকবে। অনুষ্ঠানের সময় সীমান্তের গেট বা প্রবেশদ্বারগুলিও বন্ধ থাকবে। ভারতের প্রতি পাকিস্তানের চরম শত্রুভাবাপন্ন আচরণ বর্তমানে বাড়িয়েছে ভারত সরকার ও ভারতবাসীর ক্রোধ। সেই কারণে সরকার এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বলে জানিয়েছে বিএসএফ। সীমান্তে শান্তি রক্ষার প্রক্রিয়া ও সন্ত্রাসবাদে উসকানি যে একসঙ্গে চলতে পারে না— এই পদক্ষেপের মাধ্যমে সেই বার্তাটি স্পষ্টভাবে ভারত সরকার দিয়েছে বলেও জানিয়েছে বিএসএফ।

পহেলগাঁওয়ে সন্ত্রাসবাদী হামলা পর চলতে থাকা ভারত-পাক দ্বিপাক্ষিক কূটনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্যে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আরেকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করল ভারত। গত ২৮ এপ্রিল ১৬টি পাকিস্তানি ইউটিউব চ্যানেল নিষিদ্ধ ঘোষণা করে ভারত সরকার। প্রায় ৬৩.০৮ মিলিয়ন, অর্থাৎ ৬ কোটি ৩০ লক্ষ ৮ হাজার লোক এই চ্যানেলগুলির সাবস্ক্রাইবার বা নিয়মিত দর্শক। এই চ্যানেলগুলির মাধ্যমে ভারত, ভারতীয় সেনা এবং ভারতীয় সিকিউরিটি এজেন্সি (অর্থাৎ, গোয়েন্দা বিভাগ বা নিরাপত্তা সংস্থা)-গুলির বিরুদ্ধে উসকানিমূলক কথাবার্তা বলা, ভিত্তিহীন অভিযোগ করা, ফলস্ ন্যারেটিভ (অসত্য বিমর্শ) ছড়ানো, ভুল তথ্য পরিবেশন-সহ নানা অপপ্রচার চলছিল।

গত ২৯ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দিল্লিতে একটি শীর্ষস্তরীয় নিরাপত্তা বৈঠকের সভাপতিত্ব করেন। এই বৈঠকে পাক সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলার জন্য প্রত্যাঘাতের বিষয়টি আলোচিত হয়। প্রধানমন্ত্রী জানান যে এই সন্ত্রাসবাদকে শেষ করার ব্যাপারে ভারতীয় সেনা প্রস্তুত এবং ভারত সরকার সংকল্পবদ্ধ। পহেলগাঁওয়ে সন্ত্রাসবাদী হানার জবাব দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রত্যাঘাতের পদ্ধতি, সময় ও লক্ষ্যবস্তু (টার্গেট) নির্ধারণের জন্য সেনাবাহিনীকে পুরোপুরি ফ্রি-হ্যান্ড দেওয়া হয়েছে। বিহারের জনসভায় দাঁড়িয়ে সন্ত্রাসবাদীদের কঠোর শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে তাঁর সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেছেন যে, পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত সন্ত্রাসবাদীদের তাড়া করবে ভারত। ভারতীয় বিমান বাহিনীর প্রাক্তন প্রধান ফলি হোমি জানিয়েছেন, 'পাকিস্তানকে শাস্তি দেওয়ার বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য থেকেই স্পষ্ট। তবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ নেওয়া হবে তা কেবলমাত্র জানেন ভারতের শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্ব।'

গত ৩০ এপ্রিল পাকিস্তান এয়ারলাইন্সের বিমানগুলির জন্য ভারতের আকাশপথ বন্ধ বলে ঘোষণা করে ভারত সরকার। পাক হামলার প্রেক্ষিতে ভারতের সামরিক প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা প্রতিদিন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে চলেছে। এই বিষয়ে নানা জল্পনা চললেও ভারত সরকারের পক্ষ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এখনও হয়নি। পহেলগাঁও হানার প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষেত্রে সশস্ত্র প্রতিক্রিয়ার রাস্তা গ্রহণ করলে ভারতের সামনে থাকতে পারে ১০টি সামরিক বিকল্প। পহেলগাঁওয়ে সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ ভারতের ইতিহাসকে দিয়েছে একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড়। কূটনৈতিক স্তরে বৃদ্ধি পাচ্ছে উত্তাপ। এরই মধ্যে ভারতের হাতে রয়েছে একাধিক সামরিক বিকল্প। পাকিস্তান যাতে ভারতের মাটিতে এই ধরনের সন্ত্রাসবাদী হামলার পুনরাবৃত্তি করতে না পারে, সেটি নিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত সামরিক প্রতিক্রিয়ার বিষয়টি বিবেচনা করছে ভারত সরকার।

(১) **নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর সেনা অভিযান :** নিয়ন্ত্রণরেখা জুড়ে সেনা অভিযানের বিষয়টি বিবেচনা করছে ভারত। ভারত সিন্ধু জলচুক্তি রদ করার পালটা প্রতিক্রিয়ায় সিমলা চুক্তি স্থগিত করেছে পাকিস্তান। এর ফলে নিয়ন্ত্রণরেখার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়েছে। কোনো নিয়ন্ত্রণরেখা এই মুহূর্তে না থাকায় স্থলপথে ভারতীয় সেনার কোনো অভিযান অবৈধ বা অন্যায্য নয়। সাম্প্রতিক অতীতে নিয়ন্ত্রণরেখা পেরিয়ে পাক মদতপুষ্ট জঙ্গিদের অনুপ্রবেশ বা পাক সেনার তরফে যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। এর পালটা হিসেবে নিয়ন্ত্রণরেখার ওপারে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের জঙ্গিঘাঁটি বা পাক সেনার স্ট্র্যাটেজিক আউটপোস্ট (সেনা চৌকি)-গুলিকে টার্গেট করতে পারে ভারত। পাক অধিকৃত কাশ্মীরের অংশে পাক সেনাঘাঁটি ও জঙ্গিদের ট্রেনিং ক্যাম্পগুলিকে গুঁড়িয়ে দিতে পারে ভারতীয় সেনা। সূত্রের খবর, দুর্গম ভূখণ্ড ও পাক সেনার সুরক্ষিত অবস্থানের কারণে নানা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে পারে ভারতীয় সেনা। দীর্ঘস্থায়ী সংঘর্ষ এড়াতে প্রয়োজন ঝটিকা আক্রমণ। এই সুসমন্বিত সামরিক প্রতিক্রিয়া করতে পারে বৃহত্তর সংঘাতের সূত্রপাত।

(২) **টার্গেটেড আর্টিলারি ও স্নাইপার অপারেশন :** নির্দিষ্ট টার্গেট বা লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানার ক্ষমতাসম্পন্ন আর্টিলারি বা কামানবাহিনী এবং সেনাবাহিনীর স্নাইপার অপারেশনগুলি যুদ্ধের চাপ, উত্তেজনা, পারিপার্শ্বিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস করে। এর মধ্যে রয়েছে ভারী মর্টার, শেল, নানারকমের কামান-বন্দুক ও প্রিসিশন স্নাইপিং। গত চার বছর ধরে এই পদ্ধতিটির কোনো প্রয়োগ হয়নি। এই ধরনের অপারেশন বা সামরিক অভিযানের লক্ষ্য হলো নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর শত্রুসেনার অবস্থান, তাদের সাপ্লাই (রসদ সরবরাহ) লাইন কেটে দেওয়া, শত্রুসেনার শিবিরগুলিকে

পহেলগ্রাম হত্যার পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে নিরাপত্তা বিষয়ক সর্বোচ্চ পদাধিকারীদের সঙ্গে বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

দুর্বল ও চৌকিগুলিকে ধ্বংস করা। এতে যদিও নিয়ন্ত্রণরেখা সংলগ্ন অঞ্চলে উত্তেজনা বৃদ্ধির ঝুঁকি কম; তবে বিমান বা স্থল সেনা অভিযানের তুলনায় এই ধরনের অপারেশনের স্ট্র্যাটেজিক ইম্প্যাক্ট বা কৌশলগত প্রভাব সীমিত। বড়ো মাপের সামরিক আক্রমণ না হলেও শত্রুসেনার ক্ষমতা হ্রাস করতে, এবং তাদের মনোবল ভেঙে দিতে সুসমন্বিত স্নাইপিং অভিযানগুলি কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারে।

(৩) যুদ্ধবিরতি চুক্তি বাতিল : ২০২১ সাল থেকে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কার্যকর রয়েছে একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তি। কিন্তু সাম্প্রতিক অতীতে, এই চুক্তিটি দাঁড়িয়েছে ভারতের বিপক্ষে। এই চুক্তির ফলে প্রাথমিক পর্যায়ে কাশ্মীরের সীমান্তবর্তী গ্রামগুলির মানুষের জীবনযাপনে স্বাভাবিকতা ফিরেছিল। নিয়ন্ত্রণরেখা জুড়ে গোলাগুলি কমে যাওয়ায় জম্মু-কাশ্মীরের অন্যান্য অংশে ভারতীয় সেনাবাহিনী জঙ্গি দমন অভিযানে মনোনিবেশে সক্ষম হয়। পাকিস্তান নিয়ন্ত্রণরেখা থেকে বাহিনী সরিয়ে আফগানিস্তান সীমান্ত ও বালোচিস্তানে মোতায়েন করে। এই মুহূর্তে যুদ্ধবিরতি চুক্তি বাতিল হলে নিয়ন্ত্রণরেখায় ফের সেনা মোতায়েন করতে বাধ্য হবে পাকিস্তান। ফলে পাকিস্তানেরই অন্যত্র তাদের নানারকম ক্ষতির মুখে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

(৪) সন্ত্রাসবাদীদের শিবির লক্ষ্য করে সার্জিকাল স্ট্রাইক : নিয়ন্ত্রণরেখা জুড়ে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের অংশে সন্ত্রাসবাদী শিবির ও লঞ্চ প্যাডের সংখ্যা সম্পর্কে নিয়মিত তথ্য জোগাড় করে থাকে ভারতীয় গোয়েন্দা বিভাগ। এখন সময় এসেছে সার্জিকাল স্ট্রাইকের ক্ষেত্রে এই শিবিরগুলিকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করার। ভারতের বিরুদ্ধে প্রক্সি ওয়ার চালানোর পাকিস্তানি কৌশলকে বিপর্যস্ত করতে পারে এই সার্জিকাল স্ট্রাইক। শিবিরগুলি নিয়ন্ত্রণরেখা সংলগ্ন হওয়ার দরুন জম্মু-কাশ্মীরের ভারতীয় অংশে জঙ্গি অনুপ্রবেশের ক্ষেত্রে পাকিস্তান যে সময় ও অবস্থানগত সুবিধে এতদিন পেত, শিবিরগুলির উপর সার্জিকাল স্ট্রাইক হলে সেই সুবিধাগুলি হারাতে চলেছে পাকিস্তান। ২০১৬ ও ২০১৯ সালে উরি ও পুলওয়ামায় সন্ত্রাসবাদী হামলার জবাবে দু'বার পাক অধিকৃত কাশ্মীরে সার্জিকাল স্ট্রাইক চালায় ভারতীয় সেনা। এই কারণে সন্ত্রাস দমনে সার্জিকাল স্ট্রাইক এই মুহূর্তে একটি অন্যতম বিকল্প। কিন্তু আগের বারের থেকে এবার পাকিস্তান অতি সতর্ক। এহেন যুদ্ধকৌশলটি এই কারণে পাকিস্তানের কাছে কোনো সারপ্রাইজ বা চমকপ্রদ বিষয় নয়। তবে পাকিস্তানের স্ট্র্যাটেজিক অ্যাডভান্টেজ বা কৌশলগত সুযোগসুবিধাগুলিকে শেষ করে দেবে এই সার্জিকাল স্ট্রাইক। এই ধরনের যুদ্ধকৌশলকে বাস্তবে রূপ দিতে প্রয়োজন নিখুঁত পরিকল্পনা, পাক অধিকৃত কাশ্মীরের নানা বিষয়ে রিয়েল টাইম ইন্টেলিজেন্স বা টাটকা তথ্য এবং এলিট ফোর্স (অর্থাৎ, সুদক্ষ সেনা কম্যান্ডো বাহিনী)। গত ২২ এপ্রিলের পর ভারতীয় গোয়েন্দা বিভাগ জানতে পেরেছে যে, পাক-অধিকৃত কাশ্মীর থেকে সন্ত্রাসবাদীদের শিবিরগুলি গুটিয়ে নিচ্ছে পাকিস্তান।

(৫) সন্ত্রাসবাদীদের মাথাদের হত্যা : প্রতিশোধের প্রাচীনতম রূপগুলির মধ্যে একটি হলো 'টার্গেটেড অ্যাসাসিনেশন' বা যে ব্যক্তি মূল লক্ষ্যবস্তু তাকে হত্যা। সম্প্রতি ইজরায়েল এই বিষয়টি ভালোভাবে রপ্ত করেছে। তেহরানে সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হামাস প্রধান ইসমাইল হানিয়ে, অথবা হিজবুল্লাহ প্রধান হাসান নাসরাল্লাহকে ইজরায়েল কীভাবে নিকেশ করেছিল, সেই গল্প এখন অনেকের মুখে মুখে ফেরে। পাকিস্তানের ক্ষেত্রে, পাক সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী এবং লস্কর-ই-তৈবা, জইশ-ই-মোহাম্মদের মতো

পহেলগাঁওয়ে নিহতদের পরিজনদের সঙ্গে দেখা করলেন অমিত শা।

ফঃ ৪

প্রধান সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলিকে টার্গেট করে নির্মূল করে দেওয়া যেতে পারে। অত্যাধুনিক সার্ভাইল্যান্স টেকনোলজি (নজরদারি প্রযুক্তি) এবং টার্গেটিং সিস্টেমের যুগে কোনো ব্যক্তিকে লক্ষ্যবস্তু বানানোর ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে একজন অপারেটিভের (গোয়েন্দা সংস্থা নিযুক্ত ব্যক্তির) প্রয়োজন হলেও পরের পর্যায়গুলিতে কারুর উপস্থিতির প্রয়োজন নেই।

(৬) ক্ষেপণাস্ত্র হামলা : ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপের মাধ্যমে আক্রমণের ক্ষেত্রে ভারতের হাতে একাধিক বিকল্প রয়েছে। পৃথ্বী ও অগ্নির মতো ভূমি থেকে ভূমিতে নিক্ষেপযোগ্য ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের একটি বড়ো সম্ভার ভারতের হাতে রয়েছে। এই ক্ষেপণাস্ত্রগুলির পাল্লার মধ্যে রয়েছে সমগ্র পাকিস্তান ভূখণ্ড। নিজ ভূখণ্ড ছাড়াও মোবাইল ল্যান্ড প্ল্যাটফর্ম থেকে ক্ষেপণাস্ত্রগুলিকে নিক্ষেপ করার ক্ষমতা রয়েছে ভারতের। ভারতের হাতে এমন ক্ষেপণাস্ত্র রয়েছে যা সমুদ্র বা আকাশ থেকে পাকিস্তান ভূখণ্ডের অনেক ভেতরে নিক্ষেপ করা যায়। 'ম্যাক ফাইভ', অর্থাৎ শব্দের গতির থেকে ৫ গুণ বেশি গতিসম্পন্ন হাইপারসনিক মিসাইলের অধিকারী ভারত। দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র সম্ভার-সম্পন্ন ভারতের ক্ষেপণাস্ত্রগুলির পৌঁছানোর সীমা গত দু'বছর ধরেই লোহিত সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত।

(৭) অত্যাধুনিক ফাইটার জেট বা যুদ্ধবিমানের ব্যবহার : রাফায়েল ও মিরাজ- ২০০০-এর মতো অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান ব্যবহার করে পাকিস্তানের নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে পারে ভারত। পাকিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক পরিকাঠামোগুলির উপর প্রিসিশন স্ট্রাইক বা নির্ভুল লক্ষ্যে আক্রমণ চালাতে পারে ভারতীয় বিমানবাহিনী। এতে কোল্যাটারাল ড্যামেজ বা পারিপার্শ্বিক ক্ষয়ক্ষতি হবে অনেকটাই কম। বিমানগুলি উচ্চগতিসম্পন্ন হওয়া ছাড়াও বিমানগুলিতে উন্নত রাডার ও মিসাইল সিস্টেম (ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা) রয়েছে। শত্রুদেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে ভেদ করতে এই বিমানগুলি বিশেষ কার্যকরী। বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা, বিমান হামলার দরুন উপমহাদেশ জুড়ে সামরিক টানাপোড়েন বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। আকাশসীমা লঙ্ঘনের ব্যাপারটি আন্তর্জাতিক স্তরে তদন্ত, বিচার ও পর্যালোচনার বিষয় হয়েও উঠতে পারে।

(৮) পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে 'নো ফার্স্ট ইউজ' নীতিতে পরিবর্তন : পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে 'প্রথমেই ব্যবহার নয়' নীতি অনুসরণ করে ভারত। ভারতের উপর পরমাণু হামলা হলে তবেই তার পালটা প্রতিক্রিয়ায় এই অস্ত্র প্রয়োগ করা হবে বলে নীতি গ্রহণ করেছে ভারত সরকার। তাই পাকিস্তান জানে যে কোনো পরিস্থিতিতেই প্রি-এম্পটিভ নিউক্লিয়ার স্ট্রাইক বা আচমকা পরমাণু হামলা চালাবে না ভারত। ভারত পরমাণু অস্ত্র সংক্রান্ত নীতিতে সামান্য পরিবর্তন গড়ে তুলতে পারে এক ব্যাপকতর সামরিক প্রতিরোধ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বর্তমানে ভারত নিউক্লিয়ার ট্রায়াডের বৃত্ত সম্পূর্ণ করেছে। অর্থাৎ স্থল, সমুদ্র ও আকাশপথে পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণের ক্ষমতাধর দেশ হলো ভারত।

(৯) সিমলা চুক্তি বাতিল : নিয়ন্ত্রণরেখাকেই কার্যত ভারত-পাকিস্তানের সীমান্তের মর্যাদা দেয় ১৯৭২ সালের সিমলা চুক্তি। নিয়ন্ত্রণরেখা লঙ্ঘন করে বা গোপনে নিয়ন্ত্রণরেখা পেরিয়ে ভারত ভূখণ্ডে পাক জঙ্গি অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটলেও এই রেখাটি বহু বছর ধরেই ভারত-পাক সীমান্তে পরিণত হয়েছে। সিমলা চুক্তি ও নিয়ন্ত্রণরেখা জুড়ে বলবৎ যুদ্ধবিরতি চুক্তি যদি বাতিল করা হয়, তবে এই সীমান্তটিই প্রকারান্তরে বিলুপ্ত হবে। সেক্ষেত্রে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের বড়ো অংশ পাক-দখলমুক্ত করতে কোনো সমস্যা হবে না ভারতীয় সেনার। এই পদক্ষেপটি আগামীদিনে ভারতীয় সেনাকে দিতে পারে নানা কৌশলগত সুযোগ-সুবিধা। পাক সেনা ও জঙ্গি ঘাঁটিগুলিকে লক্ষ্য করে নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর হামলার ব্যাপারেও ভাবছে ভারত।

গত ২৪ এপ্রিল সিমলা চুক্তি স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেয় পাকিস্তান। এর ফলে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে এই মুহূর্তে নিয়ন্ত্রণরেখা বা সীমান্ত বলে কিছু নেই। স্থলপথে পাকসেনা ও জঙ্গি ঘাঁটিগুলিকে ভারতীয় সেনা নিশানা করলে পরোক্ষে তা পাবে আন্তর্জাতিক আইনের সমর্থন। পাকসেনার মদতে নিয়ন্ত্রণরেখা টপকে ভারতে বহু বছর ধরেই চলছে জেহাদি, সন্ত্রাসবাদীদের অনুপ্রবেশ। গত ২২ এপ্রিলের ঘটনা চরমসীমা অতিক্রম করে গিয়েছে। পাকিস্তানের ঘোষণার পর নিয়ন্ত্রণরেখার অস্তিত্বই বর্তমানে বিলুপ্ত। তাই ২২ এপ্রিলের জবাবে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের জঙ্গি ঘাঁটিগুলি গুঁড়িয়ে দিতে ভারতীয় সেনা যেকোনো সময়, যেকোনো রকম অভিযান চালালে কোনো আইনগত অসুবিধে নেই।

(১০) ন্যাভাল ব্লকেড বা নৌ-অবরোধ : বর্তমান বিশ্বে বেশিরভাগ ব্যবসা- বাণিজ্য সমুদ্রপথে পরিচালিত হয়। আরব সাগরে পাক সমুদ্রসীমা জুড়ে নৌ-অবরোধ একটি উপযুক্ত বিকল্প হয়ে উঠতে পারে। ইয়েমেনের হুথি জঙ্গিরা দু'বছরের বেশি সময় ধরে লোহিত সাগর জুড়ে চালিয়ে যাচ্ছে নৌ-অবরোধ। এর ফলে এই সমুদ্রপথে স্তব্ধ হয়ে রয়েছে আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য। লোহিত সাগরকে মুক্ত করার লক্ষ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার সহযোগী দেশগুলি সর্বতোভাবে প্রয়াস চালালেও হুথি জঙ্গিদের দমন করা সম্ভবপর হয়নি। বিমানবাহী রণতরী বা এয়ারক্র্যাফ্‌ট্ ক্যারিয়ার মোতায়েন করা সত্ত্বেও লোহিত সাগরে হুথি সন্ত্রাসবাদ এখনও পুরোপুরি প্রতিরোধ করা যায়নি। তবে পাক উপকূল, বন্দর ও সমুদ্রসীমা জুড়ে নৌ-অবরোধের ফলাফল হতে পারে পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ বা ফুল-স্কেল ওয়ার।

(১১) ফুল-স্কেল মিলিটারি অপারেশন বা পূর্ণাঙ্গ সামরিক অভিযান : সামরিক প্রস্তুতি ও প্রত্যাঘাতের শেষতম বিকল্প হলো পূর্ণাঙ্গ সামরিক অভিযান। এই ধরনের বড়ো মাপের সামরিক অভিযানের ক্ষেত্রে একাধিক বিষয় বিচার্য। প্রথমত, স্পষ্টভাবে 'মিলিটারি অবজেকটিভ' বা সামরিক লক্ষ্য নির্ণয় এবং সেই লক্ষ্যটিকে জয়ের পরিকল্পনা। এক্ষেত্রে হামাস-ইজরায়েলের মধ্যে সংঘটিত গাজা যুদ্ধের কথা স্মরণে রাখা উচিত। গাজা যুদ্ধে ইজরায়েল যে সামরিক লক্ষ্যগুলি নির্ধারণ করেছিল, প্রায় দু'বছর ধরে ইজরায়েলের তুলনায় অনেক ক্ষীণবল হামাসের সঙ্গে যুদ্ধের পরেও সেই লক্ষ্যপূরণ কিন্তু অধরা। সামরিক লক্ষ্যপূরণের ক্ষেত্রে ইজরায়েলের সব পরিকল্পনা এখনও পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি। পাকিস্তান 'গাজা' নয়, পাক সেনাবাহিনীও 'হামাস' নয়। ভারত ও পাকিস্তান উভয়েই পারমাণবিক অস্ত্রধর দেশ। যদিও পাকিস্তানের পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের ক্ষমতা খুবই কম। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পূর্ণাঙ্গ সামরিক অভিযানের ক্ষেত্রে এই সমস্ত বিষয়গুলির চুলচেরা বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

বালাকোটে ভারতীয় বিমানবাহিনীর হামলা প্রমাণ করেছে যে, সন্ত্রাসবাদ দমনের প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রণরেখা অতিক্রম করার ক্ষেত্রে ভারতের আর কোনো কৌশলগত অনীহা নেই। গত ২২ এপ্রিলের পর এটা স্পষ্ট যে, পাক-সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে বালাকোটে ভারতীয় বিমানবাহিনীর অভিযান ও বোমাবর্ষণের প্রভাব ছিল সীমিত এবং বর্তমানে সেই প্রভাব বা ডেটারেন্ট এফেক্ট আর নেই। অতএব, স্থায়ীভাবে পাক-মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদ দমনের জন্য ভারত উপরোক্ত যেকোনো কৌশল গ্রহণ করতে পারে এবং তার মধ্যে রয়েছে 'কাইনেটিক অপশন্স' বা সামরিক বিকল্পসমূহ। পাকিস্তানের বিষদাঁত চিরতরে ভেঙে দিতে হবে যাতে তারা ভবিষ্যতে আরেকটি 'পহেলগাঁও'-এর ঘটনার মতো কোনো কিছু ঘটানোর কথা স্বপ্নেও ভাবতে না পারে।

(লেখক অখিল ভারতীয় পূর্ব সৈনিক সেবা পরিষদের রাজ্য সভাপতি)

প্রচার প্রতিনিধি বৈঠক

আসানসোলে স্বস্তিকা পত্রিকার নববর্ষ সংখ্যার প্রকাশ অনুষ্ঠান এবং প্রচার প্রতিনিধি সম্মেলন

গত ২৭ এপ্রিল সঙ্ঘের আসানসোল শহরে সুদর্শন ভবনে সকাল ১০টায় মধ্যবঙ্গের স্বস্তিকা পত্রিকার প্রচার প্রতিনিধিদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ২৩জন প্রচার প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত ছিলেন স্বস্তিকা পত্রিকার সম্পাদক ডঃ তিলকরঞ্জন বেরা, স্বস্তিকার প্রচার-প্রসার প্রমুখ জয়রাম মণ্ডল এবং সঙ্ঘের আসানসোল জেলা সঙ্ঘচালক প্রদীপ কুমার সিংহ।

এদিনই বিকেলে ভারত সরকারের পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র এবং স্বস্তিক প্রকাশনার যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় স্বস্তিকা পত্রিকার নববর্ষ সংখ্যার প্রকাশ অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন আসানসোল অগ্নিনির্বাপক কেন্দ্রের আধিকারিক তাপস ঘোষ। প্রধান অতিথি রূপে ছিলেন স্থানীয় কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডঃ গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন স্বস্তিকার সম্পাদক ডঃ তিলকরঞ্জন বেরা, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রান্ত সঙ্ঘচালক তথা স্বস্তিকা পত্রিকার প্রকাশক জয়ন্ত পাল, আসানসোল জেলা সঙ্ঘচালক প্রদীপ কুমার সিংহ।

নববর্ষ সংখ্যার প্রকাশ অনুষ্ঠান

স্বস্তিকার সম্পাদক ডঃ বেরা স্বাগত ভাষণে স্বস্তিকার জন্মলগ্ন থেকে অদ্যাবধি সুদীর্ঘ যাত্রার কথা অবগত করান। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে দীর্ঘকাল উত্তর-পূর্ব ভারতকে মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে সেখানকার সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের উপরে আলোকপাত করেন। সভাপতি মহাশয় তাঁর ভাষণে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রাসঙ্গিকতা ও বিস্তারের উপর জোর দিয়ে এক সুস্থ, সুন্দর সমাজ ও দেশ গঠনে সঙ্ঘের উদ্যোগ ও আদর্শের ভূয়সী প্রশংসা করেন। জেলা সঙ্ঘচালক তাঁর নাতিদীর্ঘ ভাষণে ইতিবাচক বিমর্শ নির্মাণে স্বস্তিকা, পাঞ্চজন্য, অর্গানাইজার প্রভৃতি পত্রিকা পঠনপাঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে গ্রাহক হবার আবেদন রাখেন। প্রধান বক্তা মনোজ চট্টোপাধ্যায় সঙ্ঘ শতবর্ষের যাত্রাপথে সমাজকে সঙ্গে নিয়ে স্বয়ংসেবকদের করণীয় কাজের বিষয়ে উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন নীলেন্দু চট্টোপাধ্যায়। সমবেত কণ্ঠে বন্দেমাতরম্ গানের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

মধ্যবঙ্গ মহিলা সমন্বয়ের উদ্যোগে দেবী অহল্যাবাঈ হোলকরের ত্রিশতবর্ষ জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন

মধ্যবঙ্গ মহিলা সমন্বয়ের উদ্যোগে এবং ভারত সরকারের পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের সহযোগিতায় গত ২৭ এপ্রিল বর্ধমান শহরের উল্লাস আবাসন চত্বরে পুণ্যশ্লোক দেবী অহল্যাবাঈ হোলকরের ত্রিশতবর্ষ জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে 'স্বনির্ভর নারী, সমৃদ্ধ সমাজ' শীর্ষক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা সমন্বয়ের অখিল ভারতীয় সহ সংযোজিকা শ্রীমতী ভাগ্যশ্রী সাঠে। অন্য বক্তা হিসেবে ছিলেন শ্রীমতী নন্দিনী রায়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা সুনীতা বটব্যাল এবং শ্রীমতী শিখা গুহ। শ্রীমতী সাঠে তাঁর অনবদ্য ভাষণে প্রশাসক হিসেবে দেবী অহল্যাবাঈয়ের ন্যায়পরায়ণতা, প্রশাসনিক দক্ষতা এবং ঐতিহাসিক দূরদর্শিতার উপরে আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, নারী কেবল পরিবারের নয়, সমাজ ও জাতির উন্নয়নের অন্যতম চালিকাশক্তি। শিক্ষিত ও সচেতন নারী সমাজের হাত ধরেই সম্ভব স্থিতিশীল ও ন্যায়ভিত্তিক উন্নয়ন।

অনুষ্ঠানের ফাঁকে সংস্কার ভারতীর শিল্পীদের পরিবেশনায় গান, আবৃত্তি ও বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ অনুষ্ঠানে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশ নির্মাণ করে। কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে ইসলামি জঙ্গিদের দ্বারা ২৬ জন নিহত হিন্দু পর্যটকদের আত্মার শান্তি কামনায় ২৬টি প্রদীপ প্রজ্বলন করে নীরব প্রার্থনা করা হয়। এরপর সারদা শিশু মন্দির ও বিবেকানন্দ শিশু বিদ্যালয়ের শিশুদের কুইজ প্রতিযোগিতা এবং মেয়েদের আত্মরক্ষামূলক বিভিন্ন কৌশল প্রদর্শিত হয়। সমাপ্তি ভাষণের আগে একক সংগীত পরিবেশন করেন অর্পিতা চ্যাটার্জী ব্যানার্জী। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর সমাপ্তি পর্বে সাংস্কৃতিক পরিবেশনা— বঙ্গের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং নারীশক্তির গৌরবময় ইতিহাস। বক্তব্য, সংগীত, প্রশ্নোত্তরে ফুটে উঠে বঙ্গের চিরায়ত ঐতিহ্য এবং সাহসী নারীর অবদান। সারাদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মধ্যবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রান্ত প্রচারক শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল এবং পূর্বক্ষেত্র বৌদ্ধিক প্রমুখ তথা মধ্যবঙ্গের মহিলা সমন্বয়ের পালক অধিকারী বলরাম দাসরায়। সমগ্র অনুষ্ঠান সুচারুরূপে সঞ্চালনা করেন প্রান্ত সংযোজিকা শ্রীমতী লতিকা চ্যাটার্জী।

বনবাসী রক্ষা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে নবীন আচার্যা প্রশিক্ষণ বর্গ

গত ২৬ থেকে ২৮ এপ্রিল দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ, আদ্যাপীঠ মন্দিরে বনবাসী রক্ষা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে নবীন আচার্য প্রশিক্ষণ বর্গের আয়োজন করা হয়। উত্তর

কলকাতা, উত্তর-পূর্ব কলকাতা এবং পূর্ব কলকাতা জেলার ৬টি প্রখণ্ড থেকে ১৮ জন আচার্যা এই বর্গে অংশগ্রহণ করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ক্ষেত্র সেবাপ্রমুখ সুধাংশু কুমার পাত্র, বর্গ আয়োজন সমিতির সভাপতি তথা কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী কল্যাণ চক্রবর্তী এবং আয়োজন সমিতির সম্পাদক চন্দন সাহা। বর্গে প্রশিক্ষক রূপে উপস্থিত ছিলেন প্রতিভা বিকাশ কেন্দ্রের কেন্দ্রীয় সংযোজক শ্রীবীরেন্দ্রজী, কেন্দ্রীয় সহ সংযোজক শ্রীধনঞ্জয় কুমারজী এবং কলকাতা ও শিলিগুড়ি মহানগরের নগর সংযোজক রতন চক্রবর্তী।

২৮ এপ্রিল বিকেলে বর্গের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কলকাতা মহানগর সম্পাদক দেবাশিস দে। ▫

বিষ্ণুর নবম অবতার সুগত বুদ্ধ

নন্দলাল ভট্টাচার্য

অবতীর্ণ হন তিনি

ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর। দেবতাদের অধীশ্বর এই ত্রিদেব। সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশের নিয়ামক তাঁরা। ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা। স্থিতি বা পালনের দায়িত্ব বিষ্ণুর। আর সবকিছুর বিনাশক হলেন মহেশ্বর বা শিব। এই ব্রহ্মাণ্ডে সাম্যের সহাবস্থান ঘটান তাঁরা।

এই ত্রিদেবের কাজের রূপটি একটু ভিন্ন। ব্রহ্মার সৃষ্ট জগতের বিলোপের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত সবকিছুর সুসম বিন্যাসের দিকে থাকে বিষ্ণুর সদাসতর্ক দৃষ্টি। বস্তত ধর্ম সংস্থাপন ও সংরক্ষণে সদাতৎপর তিনি। তার জন্য কখনো অলক্ষ্যে, আবার কখনো-বা মরলোকে অবতীর্ণ হতে হয় তাঁকে।

ধরাধামে বিষ্ণুর এই যে অবতরণ তা কিন্তু সব সময় একই রকম নয়। কখনো তিনি স্বয়ং আসেন অবতাররূপে, কখনো-বা হয় তাঁর আংশিক অবতরণ। সাধারণ অভিধায় তাই অবতার দু'রকম--- পূর্ণাবতার ও অংশাবতার। পূর্ণাবতারে বিষ্ণু প্রত্যক্ষভাবে আবির্ভূত হয়ে ঈশ্বরের সমস্ত শক্তি ও গুণাবলীর প্রকাশ ঘটান। বিষ্ণুর দশটি অবতারের মধ্যে নৃসিংহ, রাম, কৃষ্ণ হলেন পূর্ণাবতার। আংশিক অবতারেও বিষ্ণু প্রত্যক্ষভাবেই অবতীর্ণ হন, তবে এক্ষেত্রে আংশিকভাবে ঘটে তাঁর আত্মপ্রকাশ। আংশিক অবতারের মধ্যে রয়েছেন মৎস্য ও পরশুরাম।

পুরাণগুলিতে বিষ্ণুর অবতারের সংখ্যা কিন্তু এক নয়। সংখ্যাটা চার থেকে ঊনচল্লিশ। তবে সাধারণভাবে বিষ্ণুর দশটি অবতারের প্রভাবই সবচেয়ে বেশি। এই দশ অবতারের মধ্যে প্রথম চার অর্থাৎ মৎস্য, কূর্ম, বরাহ ও নৃসিংহের ঘটে সত্যযুগে। ত্রেতায় আবির্ভূত হন— বামন, পরশুরাম ও অযোধ্যাপতি রাম। দ্বাপরে আবির্ভূত হন অষ্টম অবতার, কলিতে নবম অবতার বুদ্ধ এবং আবির্ভূত হবেন কল্কি--- কলিযুগের শেষলগ্নে। অষ্টম অবতারের নাম নিয়ে অবশ্য আছে কিছু মতভেদ। কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, এমনকী বিষ্ণুরও উৎস এমন মতে বিশ্বাসীরা কৃষ্ণকে অবতারের তালিকায় রাখতে চান না। অন্যদিকে ওই তালিকায় থাকা কৃষ্ণের অগ্রজ বলরাম সম্পর্কে আবার কারও কারও বক্তব্য, বলরাম হলেন শেষনাগের অবতার, তাই দশাবতারের তালিকায় তাঁর নাম রাখা সঙ্গত নয়।

বুদ্ধ অবতার

মহাবলীপুরমের আদিবরাহ গুহাদ্বারে উৎকীর্ণ লিপিতে (সপ্তম শতক) রয়েছে,— 'মৎস্য কূর্মো বরাহশ্চ নরসিংহোহথ। বামনঃ। রামো রামশ্ব রামশ্চ বুদ্ধঃ কল্কিশ্চ তে দশঃ।।'

দ্বাদশ শতকের কবি জয়দেবও তাঁর দশাবতার স্তোত্রে এই ধারাতেই বলেছেন, 'কেশবধৃত বুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে।' বোঝা যাচ্ছে হিন্দুধর্মে বুদ্ধ অবতার রূপে স্বীকৃতি পেয়েছেন বহু আগে থেকেই। সেই স্বীকৃতির পরম্পরাই রক্ষিত জয়দেবের স্তোত্রে। অবতার হিসেবে বুদ্ধ স্বীকৃতি পেয়েছেন পৌরাণিক যুগেই।

বিশেষজ্ঞদের মতে, পুরাণ গ্রন্থগুলির লেখা শুরু হয় ৩৫০ থেকে ৭৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে। ওই পর্বে লেখা পুরাণগুলির মধ্যে আছে ব্রহ্মাণ্ড, দেবী, কূর্ম, মার্কণ্ডেয়, মৎস্য, বামন, বরাহ, বায়ু ও বিষ্ণুপুরাণ। পক্ষান্তরে অগ্নি, ভাগবত, ভবিষ্য, ব্রহ্ম, ব্রহ্মবৈবর্ত, দেবী-ভাগবত, গরুড়, লিঙ্গ, পদ্ম, শিব ও স্কন্দ পুরাণগুলির রচনাকাল ৭৫০-১০০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে।

এইসব পুরাণের মধ্যে বুদ্ধ অবতারের কথা রয়েছে হরিবংশে (১/৪১), বিষ্ণুপুরাণে

(৩/১৮), ভাগবত পুরাণে (১/৩/২৪, ২/৭/৩৭, ১১/৪/২২), গরুড় পুরাণে (১/১, ২/৩০, ৩/১৫), অগ্নি পুরাণে (১৬, ৪৯/৮), নারদীয় পুরাণে (২/৭২), লিঙ্গ পুরাণে (১/৭১), পদ্মপুরাণে (৩/৩৫২) বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতার বলে মেনে নিয়েছেন। এই পুরাণগুলির মধ্যে অগ্নি পুরাণের মন্তব্য, দৈত্যদের দমন করার জন্য বিষ্ণুই অবতীর্ণ হন বুদ্ধ অবতার রূপে।

ষষ্ঠ শতকের পর রচিত পরাশরের 'বৃহৎ পরাশর হোরা শাস্ত্র' পুস্তকের মধ্যেও (২/১-৫/৭) রয়েছে বুদ্ধাবতারের কথা। একইভাবে স্কন্দ পুরাণে (১৫১ অধ্যায়) বলা হয়েছে, 'বুদ্ধ হয়ে আমি ভ্রান্ত যুক্তি ও প্রতারণার মাধ্যমে আমি অসুরদের বিভ্রান্ত করব।'

শ্রীযোগাচার্য

হিন্দুশাস্ত্রে বুদ্ধকে বলা হয়েছে যোগাচার্য। সন্ন্যাসী দেবসুন্দর বুদ্ধের গায়ের রং হলুদ। গৈরিক বা রক্তাম্বরধারী বুদ্ধের পূজার কথা বলা হয়েছে বরাহ পুরাণে। বলা হয়েছে সৌন্দর্যদাতা বুদ্ধের পূজা করলে তিনি পূজকের বাসনা পূরণ করেন।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের মতো কোনো কোনো পৌরাণিক গ্রন্থে বলা হয়েছে, 'মোহনার্থ দানবানাং... ভগবান বাগভিরুগ্রভির অহিংসা আচিভির হরিঃ'— দৈত্যদের মোহিত করার জন্য বুদ্ধ দাঁড়ালেন পাশে শিশুর রূপে। মূর্খ জিন বা দৈত্য সেই শিশুকে সন্তান ভেবে ঘরে নিয়ে যায়। আর ওইভাবে বুদ্ধ অবতার রূপে সুচারুভাবে অহিংসার বাণীতে সঙ্গীসাথী-সহ জিনকে সম্মোহিত করলেন।

ভাগবতের প্রথম অধ্যায়েই বলা হয়েছে, কলিযুগের শুরুতেই দেব-শত্রুদের সম্মোহিত করতে তিনি অর্থাৎ শ্রীহরি বুদ্ধরূপে কিকতদেশে অঞ্জনার পুত্র হয়ে জন্ম নেন। ---'তথাঃ কলাসু সম্প্রব্রত্তে সম্মোহায় সুরাদ্বিষাম্। বুদ্ধ নামনাঞ্জন-সুতঃ কীকতেষু ভবিষ্যতি।।' (১/৩/২৪)।

বহু পুরাণেই বলা হয়েছে, ভগবান বিষ্ণু বুদ্ধ অবতারে দৈত্য বা মানবজাতিকে বৈদিক ধর্মে দীক্ষিত করার জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। যেমন ভবিষ্য পুরাণে আছে— কলিযুগে বিষ্ণু শাক্যমুনি গৌতম রূপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দশ বছর বৌদ্ধমত শিক্ষা দিলেন। তারপর শুদ্ধোধনের কুড়ি বছরের রাজত্ব শেষে শাক্যসিংহ আরও কুড়ি বছর রাজত্ব করেন। কলিযুগের প্রথম দিকে সমস্ত বৈদিক পথ ধ্বংস হয় এবং সকলেই বৌদ্ধ হয়ে যান। যারা বিষ্ণুর পায়ে আশ্রয় চেয়েছিলেন তাঁরাও বিভ্রান্ত হন।

কনস্টানস এ জোনস এবং জেমস ডি. রায়ান তাঁদের এনসাইক্লোপিডিয়া অব হিন্দুইজম' (২০০৬ খ্রি:) পৃ. ৯৬-এ সমকালীন হিন্দুধর্ম নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে জানান, বুদ্ধকে যাঁরা হিন্দুধর্মেরই একটি রূপ বলে মনে করতেন, তাঁরাই বুদ্ধকে অবতারের মান্যতা দিয়ে তাঁকে দেবতার আসনে বসান। ত্রয়োদশ শতকের আগের কিছু কিছু ধর্মগ্রন্থে বলা হয়েছে অসুররা যাতে জীবহত্যা ত্যাগ করে তার জন্য বুদ্ধ তাদের ভুল পথে চালিত করেন। সাম্প্রতিককালেও বুদ্ধকে দেবতা হিসেবে পূজা করতে দেখা যায়। অর্থাৎ একটি পরম্পরা আজও অব্যাহত রয়েছে।

এক নন গৌতম ও সুগত বুদ্ধ

বুদ্ধ বিষ্ণুর অবতার। বিভিন্ন পুরাণে একথা বলার পরও প্রশ্ন ওঠে, এই বুদ্ধ কোন বুদ্ধ? তিনি কি গৌতম বুদ্ধ, নাকি সুগত বুদ্ধ? কোনো কোনো বৈষ্ণব সম্প্রদায় মনে করেন, দশাবতারে নবম অবতার হিসেবে যে বুদ্ধের কথা বলা হয়েছে তিনি গৌতম বুদ্ধ নন। তাঁদের মতে, সুগত বুদ্ধের জন্ম ১৮০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে বোধিগয়া বা কিকটে। তিনি খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ বা পঞ্চম শতকে শাক্যবংশে আবির্ভূত সিদ্ধার্থ বা গৌতমবুদ্ধ নন। অগ্নিপুরাণ অনুযায়ী সুগত বুদ্ধ চতুর্ভুজ। তাঁর চার হাতে রয়েছে বেদ, পদ্ম, জপমালা এবং একটি ভিক্ষাপাত্র।

শিব পুরাণেও রয়েছে সুগত বুদ্ধের কথা। এখানে তিনি বিবর্ণ পোশাক পরা কেশহীন পুরুষ। ত্রিপুরাসুরকে বেদ ও শিবের উপাসনা ত্যাগ করানোর দায়িত্ব দিয়ে সন্ন্যাসী হিসেবে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছিল এবং সে কাজে সফলও হন তিনি।

ধর্ম সংস্থানাপার্থে

পুরাণ কথা, যুগে যুগে ভগবান শ্রীবিষ্ণু এই মরজগতে অবতীর্ণ হয়েছেন। কোনো কোনো যুগে তিনি আবির্ভূত হন একাধিকবার। এবং প্রতিবারই তাঁর এই অবতরণ কোনো না কোনো ধর্ম সংকটের কারণে। যখনই ধর্ম বিপন্ন হয়েছে, অধার্মিক, দুর্নীতিপরায়ণের সংখ্যা বেড়েছে, যখনই সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মপথচ্যুত দৈত্য-দানব-অসুরদের অনাচার ও অত্যাচারে পীড়িত হয়েছে পৃথিবী, তখনই দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালনের জন্য অবতাররূপে আবির্ভাব ঘটেছে তাঁর। ধর্মসংস্থাপনের পরই বিদায় নিয়েছেন তিনি। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, নবম অবতার বুদ্ধ রূপে বিষ্ণু বা শ্রীহরির যে আবির্ভাব, তার কারণটি কী? এ ব্যাপারে আমাদের চোখ রাখতে হবে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ, শিব পুরাণের মতো পুরাণগুলির উপরে।

অহমিকার শাস্তি

বিভিন্ন পুরাণ থেকে জানা যায়, আত্মগর্বে স্ফীত দেবরাজ ইন্দ্রকে শিক্ষা দেবার জন্য এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরাসুরের অত্যাচারে পীড়িত মানুষ ও পৃথিবীকে রক্ষা করার লক্ষ্যেই আবির্ভূত হন শ্রীবিষ্ণু এই পৃথিবীতে সুগত বুদ্ধরূপে।

দেব-সিংহাসনে বসার পর এক সময় ক্ষমতার মোহে মদমত্ত হয়ে ওঠেন ইন্দ্র। সে সময় এতটাই উদ্ধত হয়ে তিনি ঋষি, ব্রাহ্মণ দেবতা প্রভৃতি সকলকে শ্রদ্ধা জানানো দূরে থাক, সম্পূর্ণ অকারণে তাঁদের হতমানও করতে থাকেন। ওই অভ্যাসের বশেই একসময় তিনি দেবগুরু বৃহস্পতিকেও অপমান করেন। কেবল দেবগুরু নয়, গঙ্গাকেও তিনি অসম্মান করেন।

তাঁর ওই অহমিকা ও ঔদ্ধত্যে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন দেবগুরু বৃহস্পতি। এতদিন অন্যরা ইন্দ্রের অন্যায় আচরণ মেনে নিলেও বৃহস্পতি কিন্তু তাঁকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবার জন্যই অভিশাপ দিলেন। বললেন, অচিরেই ইন্দ্র সব ক্ষমতা হারিয়ে ভিক্ষুকের মতোই ঘুরে বেড়াবেন। লাঞ্ছিত হবেন অসুর-দানবদের হাতে। হারাবেন সব মানসম্মান, মর্যাদা, সম্পদ ইত্যাদি সবকিছু। ইন্দ্র যে অভিশপ্ত হয়েছেন, একথা জানতে পারেন ইন্দ্রের জন্মশত্রু তারকাসুর। জানতে পেরেই উপযুক্ত প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তিন পুত্রকে স্বর্গ আক্রমণ করতে বলেন।

তারকাসুরের ওই তিন পুত্র তারকাক্ষ,

কমলাক্ষ ও বিদ্যুন্মালী পিতার নির্দেশ পেয়েই ইন্দ্রকে আক্রমণ করেন। ত্রিদেবের মতোই তারকাসুরের এই তিন পুত্রকে একসঙ্গে বলা হতো ত্রিপুরাসুর। কঠিন তপস্যার বলে তাঁরা ব্রহ্মার কাছ থেকে পেয়েছিলেন বিশেষ বর। একইসঙ্গে হয়েছিলেন লোহা, রুপা ও সোনা দিয়ে তৈরি তিনটি পুরীর অধীশ্বর। স্বভাব-বীর ত্রিপুরাসুর দৈববলে অপরাজেয় একথা জানতেন ইন্দ্র। সে কারণে তাঁরা স্বর্গ আক্রমণ করলে ইন্দ্র দেবসেনাদের অরক্ষিত রেখে পালিয়ে যান। ইন্দ্রের এই কাপুরুষের মতো আচরণে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন দেবাদিদেব মহেশ্বর। তাঁর কাছে আশ্রয়প্রার্থী দেবতাদের তিনি পাঠিয়ে দেন দধীচীর আশ্রমে। আর রাজা হয়ে কর্তব্য পালন না করার কারণে ইন্দ্রকে সিংহাসনচ্যুত করে তাঁর মর্যাদা এবং সব ক্ষমতা হরণ করেন। শুধু এটুকুই নয়, তিনি ইন্দ্রকে হত্যা করার জন্যও এগিয়ে আসেন। সেসময় ব্রহ্মা ও বিষ্ণু তাঁকে নিরস্ত না করলে শিবের হাতে সেদিন অবশ্যই মৃত্যু ঘটতো ইন্দ্রের। প্রাণ পেয়ে ইন্দ্র নিজের ভুল বুঝতে পারেন। তিনি নন, তাঁর সব ক্ষমতার উৎস যে ঋষি, ব্রাহ্মণ, দেবতা এবং ত্রিদেব, এই সত্যটিও অনুধাবন করেন তিনি। কথা দেন, ভবিষ্যতে এমন ভুল তিনি আর কখনোই করবেন না।

ক্ষমতামত্ত ত্রিপুরাসুর

অহমিকার ফল কী হতে পারে তা বুঝলেন দেবরাজ ইন্দ্র। কিন্তু তারকাসুরের পুত্রেরা ক্ষমতার আরকে হয়ে ওঠেন মাতাল। ব্রহ্মার বরে তারা এখন প্রায় অপরাজেয়— অমর। তবে ব্রহ্মার সেই বরে ছিল একটা ফাঁক। এক বিশেষ মুহূর্তে তাদের ওই তিনটি পুর একই রেখায় আসবে। সেই সময় কেউ যদি এক তিরে তিনটি পুরকে বিদ্ধ করতে পারেন, তাহলেই তাদের মৃত্যু হবে। অন্যদিকে তাদের শক্তির আরেক উৎস ছিল তাঁদের স্ত্রীদের ধর্মনিষ্ঠা। স্বামীদের জন্য তাঁরা করতেন নিয়মিত ব্রত পালন। প্রকৃতপক্ষে তাঁদের ওই ব্রতই যেন অক্ষয়কবচ হয়ে জড়িয়ে ছিল ত্রিপুরাসুরের দেহে। সেটাও ছিল তাঁদের অক্ষত থাকার একটা বড়ো কারণ।

ব্রহ্মার বর, স্ত্রীদের আনুগত্য ও ব্রতনিষ্ঠা— এই দুই রক্ষাকবচে ত্রিপুরাসুর হয়ে ওঠেন দুর্দান্ত। তাঁদের অত্যাচারে ভীতসন্ত্রস্ত তখন সকলে। তাদের হাত থেকে বাঁচার জন্য দেবতারা তাই গেলেন শিবের কাছে। মিনতি জানলেন তাকে হত্যা করার জন্য। কিন্তু ত্রিপুরাসুরের দুই রক্ষাকবচের কথা মনে করে শিব প্রথমে রাজি হলেন না। আর সেই সময় বিষ্ণু এবং সমস্ত দেবতা তাঁকে সবরকমভাবে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিলে সম্মত হলেন শিব ত্রিপুরবধে।

প্রতিশ্রুতি মতোই বিষ্ণু অবতীর্ণ হলেন সুগত বুদ্ধ হয়ে। অপরূপ দেবোপম মূর্তি। মনোমোহন তাঁর রূপ। গৌরবর্ণ, কুঞ্চিত কেশদাম সুগতবুদ্ধ বিবস্ত্র অবস্থায় ধ্যানমগ্ন হলেন পথের ধারে এক বৃক্ষের নীচে।

ওই পথ ধরেই ত্রিপুরাসুরের স্ত্রীরা যান স্বামীর দীর্ঘায়ু কামনায়। সেদিনও যাচ্ছিলেন তাঁরা। যাওয়ার পথে দেখেন অনিন্দ্যসুন্দর ধ্যানমগ্ন যুবক সুগত বুদ্ধ। দেখামাত্রই তাঁদের ঘটল চিত্তবৈকল্য।

'আহা মরি মরি, কী অপরূপ রূপমাধুরী।' দেখামাত্র তাঁদের মন ধেয়ে যায় সেই ধ্যানমূর্তির দিকে। চিত্তে ডালপালা মেলে তাঁর সঙ্গে মিলনের তীব্র কামনা। অশান্ত হৃদয়ের কারণে ব্রত পালনে আসে শৈথিল্য। ঘটে বিঘ্ন। আর সে কারণেই দেবতাদের সঙ্গে সঙ্গে হারতে থাকেন ত্রিপুরাসুর। একসময় আসে সেই চূড়ান্ত সময়। ত্রিপুরাসুরের ত্রিপুর আসে একই রেখায়। সেই সন্ধিক্ষণে শিবের পিনাক ধনু থেকে নিক্ষিপ্ত হলো বাণ। এক বাণে বিদ্ধ হলো তিনটি পুর। নিহত হলো তারকাসুরের তিন পুত্র। আর কার্য শেষে বিষ্ণুর নবম অবতার সুগতবুদ্ধ আবার ফিরে গেলেন তাঁর স্বধামে।

বিষ্ণুর অবতার রূপে সুগত বুদ্ধের এই আবির্ভাবের কথা রয়েছে কৃষ্ণযজুর্বেদের তৈত্তিরীয় সংহিতায়। সুগত বুদ্ধের সহায়তায় শিব ত্রিপুরাসুককে বধ করেছিলেন পূর্ণিমা তিথিতে। পৃথিবীতে আবার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শান্তি ও ধর্মকে। তাই এই পূর্ণিমা তিথিটি ত্রিপুরারি পূর্ণিমা হিসেবে অভিহিত।

গৌতমবুদ্ধ

এতো গেল সুগত বুদ্ধের কথা। কিন্তু গৌতম বুদ্ধ। যিনি সিদ্ধার্থ, শাক্যমুনি বা শুধুই বুদ্ধদেব নামে অভিহিত, তিনি হলেন ২৮তম বুদ্ধ। সম্যক সম্বুদ্ধ বা তপস্বী এবং জ্ঞানী গৌতম বুদ্ধের উপলব্ধ সত্য ও তত্ত্বকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে বৌদ্ধ মত।

সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধের শিক্ষা হলো মিথ্যাদৃষ্টি, অজ্ঞানতা, তৃষ্ণা, পুনর্জন্ম ও কষ্ট থেকে মুক্ত হয়ে পরম সুখ বা নির্বাণ লাভের জন্য প্রয়োজন সাধনার। অতি কৃচ্ছ্রসাধন অথবা 'প্রমোদে ঢালিয়া দিনু মন'-এর মতো প্রায় নীতিহীন সাধনার কথা তিনি বলেননি। মধ্যপন্থা ছিল তাঁর ধর্মসাধনার পথ।

এক কথায় বৌদ্ধমত হলো একটি দর্শন এবং সেই সঙ্গে একটি ধর্মমার্গ। চারটি আর্যসত্য এবং অষ্টমার্গ হলো বৌদ্ধমতের ভিত্তি। বৌদ্ধমতের মূল কথা হলো, দুঃখ জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। জন্ম, মৃত্যু, রোগ ও কষ্টের মূলে রয়েছে দুঃখ। কাম, ঘৃণা ও মোহ হলো এই দুঃখের কারণ। এই দুঃখ থেকে মুক্তি ও পরম শান্তি লাভের পথ হলো নির্বাণ। সম্যকদৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক আচরণ, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি— বুদ্ধ নির্দেশিত এই আটটি উপায়কে এক কথায় বলা হয় অষ্টাঙ্গিক মার্গ। এটাকেই বলা হয় বৌদ্ধমতের মূল ভিত্তি।

গৌতম বুদ্ধ জন্মেছিলেন হিন্দু পরিবারে। তাঁর সাধনা এগিয়ে চলে হিন্দুধর্ম নির্দেশিত পথেই। কিন্তু তাতে পান না শান্তি। পান না পরমের সন্ধানও। তখনই হয় এক বিশেষ উপলব্ধি। সেই পথেই লাভ করেন বুদ্ধত্ব। আর তারপরই বহু জটিলতায় ভরা কঠিন কৃচ্ছ্র সাধনার পরিবর্তে দেন সহজ- সরল- ধর্মাচরণের পথের সন্ধান। সত্য-অহিংসা- সৎ জীবনযাপন এবং সৎ আচরণ হলো বৌদ্ধমতের মূল কথা।

বৌদ্ধমতের এই নীতিগুলি কিন্তু কোনো একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য নয়। এগুলি হলো সর্বজনীন মানবিক ধর্মবোধের আদর্শ। এই আদর্শই সর্বকালের সমস্ত মানুষকে পরিণত করে প্রকৃত মানুষে। এই নীতিতে নিহিত সৎ-সুন্দর-সাম্য-সংহতির মধ্য দিয়েই মানুষ মিলিত হয় মানুষের সঙ্গে। এটাই হলো মহামানবের সাগরতীরে এক মহাজাতিতে পরিণত হওয়ার মহান জীবনদর্শন।

(বুদ্ধপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে প্রকাশিত)

স্বদেশপ্রেমী বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথ বসু

দীপক খাঁ

কৃতিত্বের পিছনে আপনার অনুপ্রেরণা কী ছিল প্রশ্নের উত্তরে সত্যেন্দ্রনাথ সহজ সরল উত্তর দিয়েছেন— 'আমরা যে সাহেবদের চেয়ে কম নই, তা দেখিয়ে দিতে হবে। সাহেবরা যা পারে, আমরা তা পারব না কেন?' তিনি লিখছেন, 'স্কুলের পড়া শেষ হয়নি, এসে পড়ল স্বদেশীয়ানার যুগ। কিশোর বয়সে রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছি, রাখিবন্ধনের গান গেয়ে অনুভব করেছি, জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলেই ভারতমায়ের সন্তান। দীন ভারতমাতার দুঃখ দূর করতে হবে, পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙতে হবে— বিদেশির শাসন ও শোষণ থেকে বাঁচিয়ে তুলতে হবে পুরাতন ঐতিহ্যসম্পন্ন একটি মহাজাতিকে।'

ছাত্রাবস্থায় সত্যেন্দ্রনাথের মধ্যে স্বদেশপ্রেমের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছিল অনুশীলন সমিতি এবং ওয়ার্কিং মেনস্ ইনস্টিটিউটের সঙ্গে যুক্ত থাকার সুবাদে। অনুশীলন সমিতি যে ব্যায়ামগার পরিচালনা করত, তা ছিল গোপনে বিপ্লবীদের একটি কর্মকেন্দ্র। এই সমিতির উদ্যোগে ১৯০৯ সালে কলকাতার গোয়াবাগান অঞ্চলে যে 'বয়েজ ওন লাইব্রেরি' স্থাপিত হয়, সত্যেন্দ্রনাথ গোড়া থেকেই তাঁর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার বার্ষিক গ্রাহকদের প্রতি সপ্তাহে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ২১০০ টাকা (মোট ২৮০০) টাকা পাঠাতে হবে।

যে সকল গ্রাহক প্রতি মাসের পত্রিকা (৪/৫টি) একত্রে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিতে ইচ্ছুক তাদের গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ৫৫০ টাকা (মোট ১২৫০ টাকা) পাঠাতে হবে।

যোগাযোগ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫
৮৬৯৭৭৩৫২১৪

'ওয়র্কিং মেনস্ ইনস্টিটিউট' ছিল কলকাতার মানিকতলায় দিনমজুরদের জন্য পরিচালিত একটি অবৈতনিক নৈশ বিদ্যালয়। রাত্রিবেলা হ্যারিকিনের আলোয় এখানে মজুরদের লেখাপড়া শেখানো হতো। সত্যেন্দ্রনাথ নিজেই কেবল এই বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেননি, তার একাধিক বন্ধুকেও উদ্বুদ্ধ করেছিলেন এখানে শিক্ষকতা করার জন্যে।

বোস সংখ্যায়ন রচনার অল্পকাল পরে সত্যেন্দ্রনাথ যখন বিদেশ যান, নিজে মূলত তত্ত্ববিজ্ঞানী হলেও তখন ফ্রান্সে কয়েক মাস প্রথমে মাদাম কুরির ও পরে দ্য ব্রগলির সুপ্রসিদ্ধ পরীক্ষণাগারে কর্মরত ছিলেন এই উদ্দেশ্যে যে স্বদেশ গবেষণাগার গড়ে তুলতে তাঁর এই অভিজ্ঞতা কাজে লাগবে। দেশে ফিরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও পরবর্তীকালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করবার সময় সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি নির্মাণে তাঁর উৎসাহের অন্ত ছিল না। এই বিষয়ে তিনি স্বনির্ভরতার অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথের কাছে দেশপ্রেম কেবল ভাবাবেগের বিষয় ছিল না। তিনি মনে করতেন, দেশের ভালো-মন্দ সব কিছু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বিচার-বিশ্লেষণ করে চললে তবেই দেশকে সত্যিকারের মঙ্গলের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। তাঁর কাছে ছিল দেশপ্রেম মানবপ্রেমেরই অপর নাম। মানুষের কল্যাণ সম্বন্ধে বিজ্ঞানের কাছে তাঁর আশা ছিল— বিজ্ঞান সহজে মিটাবে মানুষের প্রতিদিনের চাহিদা, তার ফলে মনে জাগবে সন্তোষ, কুসংস্কার ঘুচে যাবে, পরিপূর্ণ জ্ঞানের আলোকে সত্যস্বরূপ খুঁজে পাবে মানুষ।

তিনি বলেছিলেন : 'এটা ঠিক যে দেশ বলতে যদি দেশের লোককে বোঝায়, শুধুমাত্র শিক্ষিত বা নায়ক সম্প্রদায় না হয়, যদি মনে হয় দেশের সাধারণ মানুষই দেশ, তবে তারা শিক্ষিত হলেই তো সেই দেশকে উন্নত বলা যাবে'।

বাংলা ভাষায় সত্যেন্দ্রনাথের বিজ্ঞান বিষয়ক লোকরঞ্জন রচনার প্রথম নিদর্শন 'পরিচয়' পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত 'বিজ্ঞানের সংকট' নামক প্রবন্ধ। বস্তুত ১৯২১ সালে সত্যেন্দ্রনাথ ঢাকা যাবার আগে যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করছেন, তখন প্রমথ চৌধুরী তাঁর সম্পাদিত 'সবুজ পত্র' নামক পত্রিকায় বিজ্ঞান বিষয়ে লেখবার জন্য সত্যেন্দ্রনাথকে বহুবার অনুরোধ করলেও তার এই বিষয়ে আশা পূর্ণ হয়নি। সত্যেন্দ্রনাথের বন্ধু হারীতকৃষ্ণ দেবকে একটি চিঠিতে প্রমথ চৌধুরী অভিমান করে লিখেছিলেন— 'সত্যেনদাদা কাগজের উপর কালো আঁচড় কাটেননি, বোধহয় তিনি কালো বোর্ডের উপর সাদা আঁচড় কাটাকেই তাঁর স্বধর্ম বলে স্থির করে নিয়েছেন।' 'বিজ্ঞানের সংকট' প্রবন্ধে সত্যেন্দ্রনাথ classical physics-এ সংকটের বিষয়ে আলোচনা করেছেন সহজ, সাবলীল ভাষায়। একদিকে আলো তথা সাধারণভাবে বিকিরণের, অন্যদিকে ইলেকট্রনের তথা সাধারণভাবে বস্তুকণার যে দ্বৈত চরিত্রের কথা বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে জানা গেল— অবিচ্ছিন্ন তরঙ্গের রূপ ও বিচ্ছিন্ন কণার রূপ— যা সনাতনী পর্দায় বিদ্যার ভিতকে একেবারে নাড়িয়ে দিয়েছিল। এই প্রবন্ধ প্রকাশের পরে 'পরিচয়' পত্রিকায় 'আইনস্টাইন' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠা করে তিনি বলেছিলেন— 'স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের একটা দায়িত্ব আছে, এই স্বাধীনতার যা কিছু সুফল তা যেন শুধু অল্পসংখ্যক শিক্ষিত লোকের আয়ত্তের মধ্যে না থেকে সেগুলি যেন দেশের লোকের সকলের কাছে পৌঁছে যায়।'

শিক্ষা হলো না পাকিস্তানের

দু'খানা টর্পেডোর আঘাতে ডুবে গিয়েছিল পাক সাবমেরিন পিএনএস গাজি

দুর্গাপদ ঘোষ

কথায় বলে 'শত ধৌতেন অঙ্গারস্য মলিনত্বং ন মুচ্যতে'। একশোবার ধুলেও কয়লার মলিনত্ব ঘোচে না। পাকিস্তানও কয়লার মতো একটা দেশ যাকে বারবার পর্যুদস্ত করে শিক্ষা দিলেও তাঁর নোংরা মানসিকতা ঘোচে না। কুঁজোর যেমন মাঝে মাঝে চিৎ হয়ে শোবার বাসনা জাগে, তেমনি পাকিস্তানেরও অনবরত ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জিগির ঠেলে ওঠে। অথচ তার আকার, আয়তন এবং মোট জনসংখ্যা ভারতের একটা অঙ্গরাজ্য উত্তরপ্রদেশের চাইতেও কম। জন্মলগ্ন থেকেই পাকিস্তান বস্তুত একটা সন্ত্রাসবাদী দেশ। কখনো 'হানাদার', কখনো সন্ত্রাসবাদীদের সামনে রেখে দেশটা ভারতের বিরুদ্ধে ছায়াযুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। নিরন্তর চড়-থাপ্পড় ছাড়াও অন্তত বার চারেক মোক্ষম আঘাতে ধরাশায়ী হবার পরও তার বদস্বভাব বদলাচ্ছে না। ১৯৪৮, ১৯৬৫, ১৯৭১ ও ১৯৯৯ সালে ভারত কীভাবে পাকিস্তানকে পিটিয়ে ছাল ছাড়িয়ে দিয়েছিল তা সবার জানা। এছাড়া ২০১৯ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি কাশ্মীরের পুলওয়ামায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর ওপর জঙ্গি হামলা চালানোর পরিণামে ওইবছরই ২৬ ফেব্রুয়ারি ভারত সরকারের বালাকোটে এয়ার স্ট্রাইক করে কীভাবে পাকিস্তানের কান মুচড়ে দিয়েছিল এখনও তা কেউ বিস্মৃত হয়নি। কিন্তু ওই যে কথায় বলে, 'স্বভাব যায় না মলে!' বালাকোটে সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের ঘা শুকোতে না শুকোতেই গত ২২ এপ্রিল পহলগাঁওয়ে ফের জঙ্গি পাঠিয়ে ২৬ জন নিরীহ হিন্দু পর্যটককে হত্যা করেছে। পরিণতি কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে এবং আরও কী কী ঘটতে পারে তা খোদ পাকিস্তানি মাতব্বররাও অনুমান করতে পারছেন। এই জঙ্গিস্তানের যে বিনাশকালে বুদ্ধিনাশ ঘটেছে তা এখন দিনের আলোর মতো পরিষ্কার।

পাকিস্তানের গায়ে বিগত ৭৬-৭৭ বছর ধরে সজারুর কাঁটার ঘায়ে ক্ষতবিক্ষত হওয়া বহু রকমের ক্ষতচিহ্নের কথা এখানে তুলে ধরার প্রয়োজন নেই। অবান্তর হলেও এখানে সে অবসর নেই। এমনকী ১৯৭১ সালে যা যা ঘটেছিল তার সবদিকেও যাওয়ার প্রয়োজন নেই। পাকিস্তানকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া উচিত যে, সেই যুদ্ধে তাদের নৌবহরের অন্তর্ভুক্ত একটা দূরপাল্লার সাবমেরিন 'পিএনএস গাজি'র পরিণতির কথা। এ নিয়ে বিগত ৫৪ বছর ধরে অনেক আলোচনা হয়েছে। বলিউডে 'গাজি অ্যাটাক' নামে একটা চলচ্চিত্রও নির্মাণ হয়েছে। তখন ভারতীয় নৌ-বাহিনীর শক্তি আজকের তুলনায় অনেক কম ছিল। বিমানবাহী রণতরী বলতে ছিল একমাত্র আইএনএস বিক্রান্ত। আর এখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন ভারতে বিমানবাহী যুদ্ধজাহাজ বিক্রান্ত ও বিক্রমাদিত্য ছাড়াও আরও ১৩৩ খানা রণতরী রয়েছে। অন্যদিকে, পাকিস্তানের নৌবহরে তাদের বৃহত্তম যুদ্ধজাহাজ এমএসসি আন্না-সহ কার্যশীল রণতরীর সংখ্যা হলো ৩৬ খানা। বিমানবাহী রণতরীর সংখ্যা শূন্য। পাকিস্তানের কাছে সংখ্যার হিসাবে যদিও ৮ খানা সাবমেরিন আছে কিন্তু উপগ্রহ চিত্রে ধরা পড়েছে তার মধ্যে ২ খানা অচল হয়ে পড়ে রয়েছে। বস্তুত বাতিল—স্ক্র্যাপ। আর পড়ে থাকা ৩ খানার তড়িঘড়ি মেরামতি শুরু করা হয়েছে। আপতত কার্যশীল রয়েছে ৩ খানা। পাকিস্তানের কাছে একখানাও পরমাণুচালিত ডুবোজাহজ নেই। অন্যদিকে ভারতীয় নৌবহরে সক্রিয় রয়েছে আইএনএস কালভারি, সিন্ধুঘোষ, অরিহন্ত ইত্যাদি নিয়ে মোট ১৬ খানা। তার মধ্যে ৩ খানা পরমাণু চালিত। বাকি ১৪ খানা ডিজেল, বিদ্যুৎ ইত্যাদি প্রচলিত জ্বালানি চালিত। পাকিস্তানের সবগুলোই তাই। অর্থাৎ তুলনামূলক নৌশক্তিতে ভারতের সামনে পাকিস্তান নিতান্ত তালপাতার সিপাই, নিধিরাম। তা সত্ত্বেও পাকিস্তানের নেতারা দিনরাত থেঁতলে যাবার ভয়ে কোণঠাসা হয়ে পড়া বিষধর সাপের মতো ফোঁসফোঁস করে চলেছে।

অদূর ভবিষ্যতে সিন্ধুনদের জল শুকিয়ে পাকিস্তানের মাটি কাঠ হয়ে যাবে, না সিন্ধু নদ দিয়ে ভারতীয়দের রক্তস্রোত বইবে তা গোটা বিশ্ববাসী দেখতে পাবেন। কিন্তু এই মর্মে আস্ফালনকারী এক পাক নেতা ও প্রাক্তন মন্ত্রী বিলাওয়াল ভুট্টো যেন ভুলে না যান যে তাদেরই আঁতুরঘরে তৈরি হওয়া সন্ত্রাসবাদীদের বিস্ফোরণে তার মা তথা তাঁর দেশের প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টোর দেহ ছিন্নভিন্ন হয়েছিল। যেন ভুলে না যান যে তাঁর মাতামহ তথা পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জুলফিকর আলি ভুট্টো ১৯৭১ সালে 'আমরা বাবরের বংশধর, ভারতের বিরুদ্ধে হাজার বছর ধরে লড়াই করে যাবো' বলে আস্ফালন করার দু' সপ্তাহের মধ্যে ভারতের কাছে পর্যুদস্ত হয়ে পাকিস্তানকে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছিল। বিলাওয়ালের মতো বালখিল্য পাক নেতারা যেন ভুলে না যান যে সেদিন তাঁদের নৌবাহিনীর একটা মোক্ষম অস্ত্র পিএন এস

> **পাকিস্তান এমন একটা আগাছা যা ভাঙে তবু মচকায় না। গাজি'র অকাল মৃত্যুর কথা মানলেও ভারতের হাতে ধ্বংসের কথা পাকিস্তান কখনও স্বীকার করেনি। বলে এসেছে অকস্মাৎ মাইন বিস্ফোরণ ঘটে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে নষ্ট হয়ে গেছে।**

ফঃ ৫

গাজিকে ভারতীয় নৌসেনারা কী কৌশলে বঙ্গোপসাগরের তলায় চিরকালের মতো সলিল সমাধি ঘটিয়েছিল।

১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর। রণে ভঙ্গ দিয়ে দুহাতে সাদা পতাকা উঁচিয়ে আত্মসমর্পণ করার মাত্র ১৩ দিন আগের কথা। সন্ধ্যে ৬টার সময় ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী দেশকে জানালেন যে পাকিস্তানি বিমানবহর অকস্মাৎ অমৃতসর, পাঠানকোট, শ্রীনগর, অবন্তীপুর, যোধপুর, আম্বালা ও আগ্রায় বোমা বর্ষণ করেছে। তখন জল, স্থল ও আকাশ—তিন ক্ষেত্রেই মার্কিন রণসম্ভারে সজ্জিত হয়ে পাকিস্তান সামরিক দিক থেকে যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। ভারত ছিল মুখ্যত তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের অস্ত্রনির্ভর। বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামকে কেন্দ্র করে ওই ৩ ডিসেম্বর থেকে সরকারিভাবে যুদ্ধ শুরু হয়। তবে তার দিন পনেরো আগে থেকে পাকিস্তান ডুবে ডুবে জল খাচ্ছিল। স্থল ও বিমানবাহিনীকে সামনে রেখে জলের তলা দিয়ে তলে তলে এগিয়ে আসছিল তাদের সবচাইতে বড়ো ও সবচাইতে দূরপাল্লার ডুবো জাহাজ পিএনএস গাজি। ২৭ নভেম্বরের মধ্যে তা এসে ঘাঁটি করে বসে ভারত মহাসাগর থেকে ভারতের প্রধান নৌবন্দর বিশাখাপত্তনমে প্রবেশ পথের ৫—১০ নটিক্যাল মাইলের মধ্যে। টর্পেডো ও মাইন নিয়ে তাক করতে থাকে তখন ভারতের একমাত্র বিমানবাহী রণতরী আইএনএস বিক্রান্তকে ধ্বংস করে দেবার জন্য। সেই সঙ্গে ভারতের জলসীমার বাইরে দিয়ে এগিয়ে আসছিল পাকিস্তানের ৪ খানা ছোটো যুদ্ধজাহাজও। যদিও ভারতের নৌবহরও সক্রিয় ছিল এবং পাকিস্তানের নৌশক্তির তুলনায় ছিল যথেষ্ট শক্তিশালীও। কিন্তু পাক সামরিক কর্তাদের ধারণা ছিল আমেরিকার কাছ থেকে লিজে পাওয়া এবং দ্রুত আক্রমণে সক্ষম ওই সাবমেরিন থেকে আইএনএস বিক্রান্তকে ধ্বংস কিংবা অকেজো করে দিতে পারলে তাঁরা যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারবেন, যুদ্ধটা পাকিস্তানের পক্ষে চলে আসবে। কারণ নৌশক্তিতে ভারত অনেকখানি এগিয়ে থাকলেও তাঁদের বিমানবাহিনীতে রয়েছে আমেরিকার কাছ থেকে পাওয়া অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান এফ-১৫ এবং এফ-১৬। অন্যদিকে ভারতের হাতে রয়েছে সোভিয়েত রাশিয়া থেকে পাওয়া যুদ্ধবিমান মিগ-২১ এবং খুব ছোটো ও কম শক্তিশালী যুদ্ধবিমান 'ন্যাট'। তাছাড়া তখন বিশ্বের সবচাইতে বড়ো শ্যাফি ট্যাঙ্কও ছিল পাকিস্তানের হাতে।

১৯৬৫ সালের যুদ্ধে আমেরিকার কাছ থেকে পাওয়া প্যাটন ট্যাঙ্ক নিয়েও পাকিস্তানকে ল্যাজেগোবরে হতে হয়েছিল। সেজন্য ১৯৭১ সালে আমেরিকার কাছ থেকে কিনেছিল চাকায় মোটা রবারের টায়ার লাগানো দৈত্যাকার শ্যাফি ট্যাঙ্ক। রবারের টায়ার থাকায় যা চলার সময় খুব কম আওয়াজ হতো। কিন্তু এখন থেকে ৫৪ বছর আগেও পাকিস্তানি রণপিপাসুরা বুঝতে পারেনি যে যুদ্ধটা কেবল রণসম্ভারের কিম্বা অস্ত্রবলে জেতা যায় না। আজকের দিনে যুদ্ধ হয় বুদ্ধিমত্তায়, প্রযুক্তিগত কৌশলে এবং গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে। যেসব ক্ষেত্রে ভারত এখন অনেক দূর এগিয়ে গেছে। তাছাড়া এখন ভারতের কাছে রয়েছে শতাধিক নিজস্ব উপগ্রহ। যেখানে পাকিস্তান এখনও চীন-সহ অন্যান্য দেশের ওপর নির্ভরশীল। এখন আর ভাড়াটে সৈন্য নিয়ে যেমন যুদ্ধ জেতা যায় না, তেমনি ভাড়া করা প্রযুক্তি নিয়েও নয়।

পিএনএস গাজি-র ওপর পাকিস্তান যত বেশি নির্ভর করেছিল তার চাইতে কয়েক গুণ বেশি মাত্রায় সক্রিয় ছিল ভারতের নৌ-গোয়েন্দাদের প্রযুক্তি কৌশল। ভারত মহাসাগরে প্রবেশ করার পর থেকেই পিএনএস গাজি-র সংকেত বার্তা ধরে ফেলতে থাকে ভারতীয় নৌবাহিনীর মেরিন রাডার। পাকিস্তানকে বিভ্রান্ত করার জন্য নৌবাহিনীর কর্তারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত আইএনএস রাজপুত নামের একখানা প্রায় জংধরা ডেস্ট্রয়ার (যুদ্ধ জাহাজ)-কে ট্রান্সমিশনের মাধ্যমে অনবরত সংকেত পাঠিয়ে যেতে থাকেন। যাতে পাকিস্তানের স্থির বিশ্বাস জন্মে যে 'রাজপুত'-এর অবস্থানেই আইএনএস বিক্রান্ত রয়েছে। উপগ্রহ না থাকায় পাকিস্তানের পক্ষে বিক্রান্তের সঠিক অবস্থান এবং গতিবিধি জানা সম্ভব ছিল না। ফলে ভারতের এই কৌশলে ফাঁদে পড়ে যায় পাকিস্তান। বিক্রান্ত বিশাখাপত্তনমের আশেপাশে রয়েছে ধরে নিয়ে পাক সাবমেরিন গাজি ভারত মহাসাগর থেকে বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করে এগিয়ে আসতে থাকে। এদিকে বিক্রান্তকে চুপিসারে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় এমন এক দিকে যা ছিল পাকিস্তানের ধারণার বাইরে। আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের কাছে।

ডিসেম্বরের একেবারে গোড়ার দিকে ভারতের নৌ-গোয়েন্দারা নিশ্চিত হয়ে যান যে 'গাজি' চেন্নাই ও বিশাখাপত্তনমের মাঝামাঝি কোথাও জলের তলায় লুকিয়ে আছে। ইতমধ্যে ১ ডিসেম্বর ভাইস অ্যাডমিরাল এন কৃষ্ণন যিনি তখন ইস্টার্ন নেভাল কমান্ডের কমান্ডিং অফিসার ছিলেন, পরিকল্পিতভাবে এমন কিছু সংকেত পাঠান যাতে গাজি'র পরিচালকের নিশ্চিত ধারণা হয়ে যে তারা আইএনএস বিক্রান্ত-এর সন্ধান পেয়ে গেছে। সেই সংকেতবার্তা ছিল এই রকম যে ডেস্ট্রয়ার রাজপুত-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত লেঃ কমান্ডার ইন্দর সিংহ যেন বিক্রান্তকে সরিয়ে নিয়ে যান। বলা বাহুল্য, 'রাজপুত' নামের ওই ডেস্ট্রয়ারকে তখন 'বিক্রান্ত' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। পরিকল্পনা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত ঝুঁকির ছিল। বিশেষ করে তখন রাজপুত-এ মোতায়েন ছিলেন ১০ জন নেভি অফিসার-সহ ২৫০ জন নাবিক। কিন্তু ইন্দর সিংহ দৃঢ়ভাবে জানিয়ে ছিলেন যে তিনি এই চ্যালেঞ্জটা নিতে প্রস্তুত। সেইমতো 'রাজপুত'-কে তিনি বিশাখাপত্তনম নৌঘাঁটি থেকে ১৬০ নটিক্যাল মাইল দূরে সরিয়ে নিয়ে যান। সেই সময়ু রাজপুত-এর ওয়ারলেস ফ্রিকোয়েন্সির ভল্যুম অনেকটা বাড়িয়ে দেন। যাতে পাকিস্তানের মনে হয় 'বিক্রান্ত' পিএনএস গাজির কাছে এগিয়ে আসছে। সাপে-নেউলের মতো এই লুকোচুরি খেলার পর্যায়ে ৩ ডিসেম্বর পর্যাপ্ত পরিমাণে জ্বালানি ভরে এবং অন্তত ২০ দিনের মতো খাবারদাবার মজুত করে রাত ১১টার সময় 'নেউল' রাজপুত ভাইজাগ থেকে রওনা দেয়। তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই টর্পেডো এবং মাইন-এ পেট মোটা করে থাকা 'সাপ' গাজির সংকেত বার্তার ফ্রিকোয়েন্সি ধরে ফেলে। নিখুঁত অবস্থান সম্পর্কে স্থির নিশ্চিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই রাজপুত থেকে দু'দুটো টর্পেডো ছোড়া হয় এবং তা তীব্রগতিতে ছুটে গিয়ে গাজি-তে আঘাত করে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সমুদ্রের গভীরে বিস্ফোরণের শব্দও শোনা যায়। কিছুটা জল তোলপাড় হয়ে ওপরে উঠে আসে। ১১ জন পাক নেভি অফিসার এবং ৮২ জন নাবিককে নিয়ে সলিল সমাধি ঘটে সেই সময় পাকিস্তানের সবচাইতে বড়ো এবং সবচাইতে ভরসার সাবমেরিন পিএনএস গাজি'র।

এই মেরিন এনকাউন্টারের দু'দিন পরে আইএনএস অক্ষয় থেকে কয়েকজন ডুবুরিকে অনুসন্ধানের জন্য সমুদ্রে নামানো হয়। তাঁরা সমুদ্রতলে গিয়ে দেখেন পাকিস্তানি আস্ফালনের এক বড়ো প্রতীক 'গাজি' সেখানে বিধ্বস্ত অবস্থায় মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে। তার খেল খতম হয়ে গেছে। কিন্তু ঘটনা হলো, পাকিস্তান এমন একটা আগাছা যা ভাঙে তবু মচকায় না। গাজি'র অকালমৃত্যুর কথা মানলেও ভারতের হাতে ধ্বংসের কথা পাকিস্তান কখনও স্বীকার করেনি। বলে এসেছে অকস্মাৎ মাইন বিস্ফোরণ ঘটে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। □

পাকিস্তানি নাগরিকদের বহিষ্কার ও বর্তমান আইন

ধর্মানন্দ দেব

কাশ্মীরে জঙ্গি হামলা ও নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর ধারাবহিক আক্রমণের প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে বেশ কিছু কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বিশেষ করে পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কিত যে কোনো সম্ভাব্য নিরাপত্তা ঝুঁকি প্রতিহত করতে কেন্দ্র সরকার সিদ্ধান্ত নেয়, পাকিস্তানি নাগরিকদের ভারতে প্রবেশ ও অবস্থানের ওপর সাময়িক নিষেধাজ্ঞা জারি করতে হবে। এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২৫ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ফরেনার্স-১ ডিভিশনের পক্ষ থেকে একটি নির্দেশনা জারি হয়।

নির্দেশনায় বলা হয় যে, পাকিস্তানের নাগরিকদের জন্য পর্যটন, চিকিৎসা, ব্যবসা, শিক্ষা, ক্রীড়া ও সম্মেলন সংক্রান্ত সব রকমের ভিসা পরিষেবা বাতিল করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত ২৭ এপ্রিল ২০২৫ থেকে কার্যকর হয়। যদিও মেডিক্যাল ভিসা, এলটিভি, কূটনৈতিক ও সরকারি ভিসাগুলি এই নিষেধাজ্ঞার আওতার বাইরে রাখা হয়। তবে যারা ইতিমধ্যেই ভারতে অবস্থান করছেন, বিশেষ করে সার্ক ভিসাধারী, তাঁদের ২৬ এপ্রিলের মধ্যে এবং চিকিৎসা ভিসাধারীদের ২৯ এপ্রিলের মধ্যে ভারত ত্যাগ করতে বলা হয়। এই নির্দেশ কার্যকর হওয়ায় পঞ্জাবের আটারি সীমান্ত দিয়ে পাকিস্তানে ফিরে যান অন্তত ৫৩৭ জন নাগরিক।

ভারতে বিদেশিদের প্রবেশ, অবস্থান ও বহিষ্কারের ক্ষেত্রে মূলত The Foreigners Act, 1946 প্রযোজ্য। এই আইনের ধারা ৩(১) অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার বিদেশিদের প্রবেশ, চলাচল, বসবাস এবং বহিষ্কারের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে। একই সঙ্গে The Foreigners Order, 1948 অনুযায়ী Leave India Notice জারি হলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিদেশিকে ভারত ত্যাগ করতে হয়। এই আইনের লঙ্ঘন করলে তা অপরাধ হিসেবে গণ্য হয় এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বিচারের সম্মুখীন হতে হয়। Passport (Entry into India) Act, 1920 ও The Passport Act, 1967-এও অনুরূপ বিধান রাখা হয়েছে।

এই আইনের অধীনে অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে Foreigners Act-এর ধারা ১৪ অনুসারে সর্বোচ্চ পাঁচ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডের বিধান রয়েছে। এছাড়া, ধারা

১৪ (খ)-এ ন্যূনতম দুই বছরের কারাদণ্ড এবং ন্যূনতম ১০ হাজার টাকা জরিমানার কথা বলা হয়েছে। Leave India Notice পাওয়ার পরেও ভারত ত্যাগ না করলে বিদেশি নাগরিক এই ধারা অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য হবেন। বিচার বিভাগের একাধিক রায়ে এই দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, Mohd. Anwar বনাম State of Bihar (1992) মামলায় এক পাকিস্তানি নাগরিক, যিনি বাংলাদেশের মাধ্যমে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন, তাঁকে আদালত অবৈধ অবস্থানের জন্য দোষী সাব্যস্ত করে সাজা দেয়।

ভারতের বর্তমান আইন কাঠামো আরও শক্তিশালী করতে সরকার ৪ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে The Immigration and Foreigners Act, 2025 গেজেটে প্রকাশ করে। যদিও এই আইন এখনো কার্যকর হয়নি, কারণ ধারা ১ (২)-এ বলা হয়েছে, এটি কেন্দ্র সরকারের নির্ধারিত তারিখে কার্যকর হবে, তবুও এটি আগাম ভবিষ্যতের জন্য একটি দৃঢ় পদক্ষেপ হিসেবে পরিগণিত। নতুন আইনে শাস্তির মাত্রা বাড়ানো হয়েছে। বিশেষত, ধারা ২৩ অনুযায়ী অবৈধ অবস্থান কিংবা ভিসার শর্ত লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে তিন বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড এবং তিন লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে।

কাশ্মীরের মতো স্পর্শকাতর অঞ্চলে সীমান্তপারের জঙ্গি কার্যকলাপ ও পাকিস্তান মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদের প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্ত সময়োপযোগী এবং রাষ্ট্রীয় স্বার্থে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আইনতভাবেও এই পদক্ষেপ যথার্থ এবং বিদ্যমান আইনি কাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ ধরনের আইন শুধু বিদেশিদের নিয়ন্ত্রণে নয়, বরং ভারতের সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রেও অপরিহার্য। জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও আইনের কার্যকর প্রয়োগের মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তকে বাস্তব রূপ দেওয়াই হবে প্রশাসনের পরবর্তী দায়িত্ব।

ভারতে দীর্ঘদিন ধরে অবস্থানকারী বিদেশি নাগরিকদের নিয়ে সরকারের সাম্প্রতিক অবস্থান স্পষ্টতই কঠোর হয়েছে বলা যায়। বিশেষত পাকিস্তান থেকে আগত এমন মহিলাদের ক্ষেত্রে, যাঁরা বিবাহসূত্রে ভারতে এসেছেন কিন্তু নাগরিকত্বের চূড়ান্ত অনুমোদন পাননি বা এলটিভি-র আবেদন করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে 'Leave India Notice' জারি করা উচিত। কেননা শুধুমাত্র বৈবাহিক সম্পর্কের ভিত্তিতে কোনো বিদেশি নাগরিককে স্থায়ীভাবে বসবাসের অধিকার দেওয়া যায় না, যদি না তিনি ভারতীয় নাগরিকত্ব আইন অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ নাগরিক হিসেবে স্বীকৃত হন। এই বাস্তবতায় রাবিয়া আয়ুষের কাহিনি একটি প্রাসঙ্গিক ও শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠে।

রাবিয়া আয়ুষ পাকিস্তানের করাচিতে জন্মগ্রহণ করেন ১৯৮০ সালে। ২০১৩ সালে তাঁর বিয়ে হয় অসমের মহম্মদ আয়ুষের সঙ্গে, যিনি বর্তমানে তিনসুকিয়া শহরের এক ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। রাবিয়া ভারতে আসেন ২০১৬ সালে এবং ভিসার ভিত্তিতে স্বামীর সঙ্গে বসবাস শুরু করেন। এখন দীর্ঘমেয়াদি ভিসার আবেদন করেছেন বলে জানা যায়। যদিও তাঁর নাগরিকত্বের জন্য আবেদন জমা পড়ে, কিন্তু এখন পর্যন্ত চূড়ান্ত অনুমোদন পাননি। বর্তমানে তিনি বরপাথর এলাকায় স্বামীর পরিবারের সঙ্গে বসবাস করছেন।

শুধু রাবিয়া আয়ুষের ঘটনা নয়, আমরা যদি দিল্লির মিসেস সানা খানের ঘটনা দেখি, তখন দেখতে পাব পাকিস্তানি নাগরিক ও ভারতীয় নাগরিক সঞ্জয় শর্মার স্ত্রী মিসেস সানা খান ২৩ এপ্রিল ভারত সরকারের ইমিগ্রেশন ব্যুরোর কাছে একটি দীর্ঘমেয়াদি ভিসার জন্য আবেদন করেন (অ্যাপ্লিকেশন নম্বর : ২৩০৪২৫ই ২৬ এক্স ৪১)। যদিও আবেদনটি প্রাথমিকভাবে গৃহীত হয়, তবে ২৫ এপ্রিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক হঠাৎ করেই একটি আদেশ জারি করে তার আবেদন প্রক্রিয়া স্থগিত রাখে। এই পরিস্থিতিতে, মিসেস খান দিল্লি হাইকোর্টে একটি রিট পিটিশন দায়ের করে আবেদনটির দ্রুত পুনর্বিবেচনা, স্থায়ীভাবে ভারতে বসবাসের অনুমতি এবং ২৬ মার্চ ২০২৫ থেকে ৯ মে ২০২৫ পর্যন্ত বৈধ থাকা তার বর্তমান রেজিস্ট্রেশন পারমিট বাতিল বা স্থগিত না করার জন্য দিল্লি হাইকোর্টে মামলা করে আবেদন করেছিলেন।

আদালতে শুনানির সময় বিচারপতি সচিন দত্ত জানিয়েছেন, The Foreigners Act, 1946 অনুযায়ী বিদেশি নাগরিকদের ভিসা বা বহিষ্কারের বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তের উপর বিচার বিভাগীয় হস্তক্ষেপের সুযোগ অত্যন্ত সীমিত, বিশেষ করে যখন বিষয়টি জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে সম্পর্কিত। ডিজিটালি স্বাক্ষরিত সরকারি আদেশের ব্যাপারেও আদালতের করণীয় নেই বলে জানান বিচারপতি। বিচারপতি আরও বলেন, Hans Muller of Nurenburg বনাম Superintendent, Presidency Jail, Calcutta মামলায় (১৯৫৫) সুপ্রিম কোর্ট বলেছে— 'The Foreigners Act বিদেশিদের ভারত থেকে বহিষ্কারের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারকে সম্পূর্ণ ও অবারিতভাবে প্রদান করেছে এবং সংবিধানে এর উপর কোনো রকম সীমাবদ্ধতা নেই।'

এই পর্যায়ে, পিটিশনারের সিনিয়র আইনজীবী আদালতের অনুমতি নিয়ে আবেদনটি প্রত্যাহার করেন। ফলে দিল্লি হাইকোর্ট রিট পিটিশনটি প্রত্যাহারযোগ্য হিসেবে খারিজ করে দেয় এবং মামলার সকল আবেদন নিষ্পত্তি করে।

এখানে মূল প্রশ্নটি হচ্ছে, একজন বিদেশি নাগরিক, যাঁর স্বামী ভারতীয় হলেও, তিনি নাগরিকত্ব না পাওয়া পর্যন্ত ভারতীয় মাটিতে কতটা নিরাপদ ও বৈধভাবে অবস্থান করতে পারেন? ভারতীয় নাগরিকত্ব আইন, ১৯৫৫ অনুযায়ী, বিদেশি নাগরিক বিবাহসূত্রে নাগরিকত্ব লাভ করতে পারেন বটে, তবে নির্ধারিত শর্ত ও সময়কাল পূরণের পরেই সেটি প্রযোজ্য হয়। এছাড়া, আবেদন প্রক্রিয়া চূড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত, আবেদনকারী কেবল ভিসার শর্তে ভারতের মাটিতে অবস্থান করেন। The Foreigners Act, 1946 স্পষ্টভাবে বলে দেয় যে, কোনো বিদেশির উপস্থিতি দেশের নিরাপত্তা, জনস্বার্থ বা পররাষ্ট্রনীতির সঙ্গে সংঘর্ষমূলক মনে হলে, সরকার যে কোনো সময় তাঁকে দেশত্যাগের নির্দেশ দিতে পারে।

(লেখক পেশায় আইনজীবী)

একটি বলিষ্ঠ নাট্য প্রযোজনা তক্ষক

সাগ্নিক বন্দ্যোপাধ্যায়

বেহালা ‘অভিনব নাট্যগোষ্ঠী’-র ঐকান্তিক উদ্যোগে এবং সুদক্ষ নির্দেশক অসিত রঞ্জন ভট্টাচার্যের নির্দেশনায়, ৩০ মার্চ, ২০২৫, সন্ধ্যা ৬টায় দক্ষিণ কলকতার ঐতিহ্যপূর্ণ রাসবিহারীর ‘মুক্তাঙ্গন প্রেক্ষাগৃহে’ মঞ্চস্থ হলো কিংবদন্তি নাট্যকার মনোজ মিত্র রচিত নাটক ‘তক্ষক’। ভারতবর্ষের চিরায়ত মহাকাব্য মহাভারতের ভিত্তিভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত এই নাটকের কাহিনি অগ্রসর হয়েছিল কুরুবংশের সর্বশেষ সম্রাট পরীক্ষিৎকে কেন্দ্র করে। শিকারের মতো চিত্তবিনোদনের এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার পরিস্ফুটনের মধ্য দিয়ে কাহিনির সূচনা হলেও নাটকের সমাপ্তি ঘটে রাজাধিরাজের জ্ঞানচক্ষু উন্মোচন তথা তাঁর সুগভীর জীবনবোধ জাগরণের মধ্য দিয়ে। তবে এই আত্মোপলব্ধির নেপথ্যে মূল অনুঘটক তথা কাহিনির প্রাণশক্তি নিহিত ছিল মহাঋষি শমীক এবং তাঁর পুত্র শৃঙ্গীর অংশীদারিত্বে। এছাড়া সারথি তন্ত্রীপালের নিঃস্বার্থ সেবাভাব ও মন্ত্রীর অবিচল আনুগত্য যে কাহিনির অন্যতম উপজীব্য হিসেবে ধরা দিয়েছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

মহারাজা পরীক্ষিতের ভূমিকায় সৌরভ মুখার্জির অনবদ্য উপস্থাপনা যেন সূচনাপর্বেই দর্শকদের করে তুলেছিল বিমোহিত; অনুরূপভাবেই তন্ত্রীপালের ভূমিকায় রাজু দাস ও মন্ত্রী রূপে দেবাশিস মাইতির আত্মনিবেদিত অপূর্ব অভিব্যক্তির গুণে কাহিনির চরিত্ররা পদার্পণ করেছিল বাস্তবের দুনিয়ায়। এছাড়া মহাঋষি শমীকের চরিত্রে সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধ্যানগম্ভীর তথা দৃঢ় চরিত্রাঙ্কন। অপরদিকে নাটকের নামভূমিকায় সাগ্নিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনবদ্য উপস্থাপনা যেমন একাধারে ছিল তার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ক্রোধদীপ্ত মূর্তি, অপরদিকে কাহিনির শেষাঙ্কে অনুতপ্ত ক্ষমাসুন্দর প্রদর্শন। সবমিলিয়ে প্রাচীনকাল, আধুনিক সমাজের দ্বন্দ্ব এবং মনস্তাত্ত্বিক জটিলতাকে মিশিয়ে এক অনবদ্য শিল্পভাষ্য, যা ছিল কাহিনির মূল সুর, তা যেন পৌঁছে গিয়েছিল দর্শকমণ্ডলীর হৃদয়াসনে।

অধিকন্তু, নাটকের ভূমিকায় পিতৃহত্যার প্রতিশোধ কল্পে পরিক্ষিৎপুত্র জন্মেজয়ের সর্পমেধ যজ্ঞের সূচনা, ব্যাসদেব ও দেবরাজ ইন্দ্রের কথোপকথন, বৈশম্পায়ন ঋষির মহাভারত পাঠ— একটি অনবদ্য দৃশ্যপটের সৃষ্টি করে। জন্মেজয়ের ভূমিকায় সুব্রত ঘোষের দৃঢ়তাব্যঞ্জক অভিব্যক্তি এবং মহাভারত পাঠরত বৈশম্পায়ন ঋষির ভূমিকায় অভীক সামন্তের উপস্থাপনা অনবদ্য। অনিন্দ্যসুন্দর মঞ্চভাবনা, দৃশ্যপট নির্মাণে এবং অসাধারণ রূপসজ্জা তৈরিতে শিল্পীবর্গের মুনশিয়ানা অবশ্যই দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নাটকটির গতিময়তায় তন্নিষ্ঠ দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ আবেশ, এই নাট্যগোষ্ঠীর সদস্যদের পরমতম প্রাপ্তি। আবহসংগীত ও শব্দ প্রক্ষেপণ এবং আলোক সম্পাতের দুর্বলতার দিকটি বাদ দিয়ে বলাই যায় যে, ‘বেহালা অভিনব নাট্যগোষ্ঠীর’ এক বলিষ্ঠ নাট্য প্রযোজনা ‘তক্ষক’।

উল্লেখ্য, এই নাট্যগোষ্ঠীর দ্বিতীয় নিবেদন ছিল অসিত ভট্টাচার্যের নির্দেশনায় দমফাটা হাসির স্বল্পদৈর্ঘ্যের নাটক— ‘বিবাহ বিচ্ছেদ’। এই নাটকে দম্পতির ভূমিকায় চিরন্তন চক্রবর্তী ও অঞ্জুলিকা রায় এবং আইনজীবীর ভূমিকায় অভীক সামন্তের অভিনয় সমস্ত প্রেক্ষাগৃহে হাসির ফোয়ারা ছোটে। উপরোক্ত দুটি নাটকের মধ্যবর্তী সময়ে চিরন্তন চক্রবর্তী পরিচালিত যোগাসন নৃত্যানুষ্ঠান দর্শকদের বিপুল প্রশংসা অর্জন করে। □

শিক্ষার উদ্দেশ্য

শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য শুধু তথ্য সংগ্রহ, পরীক্ষায় ভালো ফল করা বা চাকরি পাওয়ার জন্য ডিগ্রি অর্জন নয়; বরং এটি হওয়া উচিত এমন একটি প্রক্রিয়া যা একজন ব্যক্তিকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে এবং তাকে জীবনের প্রতিটি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত করে। প্রকৃত

শিক্ষা আমাদের আত্মবিশ্বাসী করে তোলে, মানসিক দৃঢ়তা ঘটায় এবং প্রতিকূলতার সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর শক্তি জোগায়। শিক্ষা আমাদের চিন্তা করতে শেখায়, সৃজনশীল করে তোলে এবং কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করে। শিক্ষা হলো মানবজীবনের সর্বোচ্চ বিকাশের পথ।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, ‘শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত জীবন গঠন, চরিত্র গঠন এবং এমন মন তৈরি করা যা নির্ভয়ে দাঁড়াতে সাহায্য করতে পারে।’ সুতরাং প্রকৃত শিক্ষা মানুষের মধ্যে নৈতিকতা, সহানুভূতি, আত্মনির্ভরশীলতা এবং দায়িত্ববোধ জাগ্রত করে। আমাদের শুধু পুঁথিগত বিদ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে আমাদের ভেতরের শক্তিকে জাগিয়ে তোলে, আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান করে এবং জীবনের প্রতিটি চ্যালেঞ্জ গ্রহণের সাহস দেয়। শ্রীমা সারদাদেবী একথা স্পষ্ট করে বলেছেন, ‘ নিজের উপর বিশ্বাস রাখা শিখো। যদি নিজের শক্তিতে বিশ্বাস না থাকে, তবে তুমি কোনো কিছুতেই সাফল্য লাভ করতে পারবে না।’

শিক্ষা আমাদের শেখায় কীভাবে ব্যর্থতা থেকেও উঠে দাঁড়াতে হয় এবং কীভাবে সেগুলোকে সাফল্যের সোপান হিসেবে ব্যবহার করতে হয়। একজন প্রকৃত শিক্ষিত মানুষ জানেন যে, জীবনে চলার পথে চ্যালেঞ্জ আসবেই, কিন্তু তিনি কখনো হার মানবেন না। বরং প্রতিটি বাধাকে জয় করার জন্য নিজের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও আত্মবিশ্বাসকে কাজে লাগাবেন। জীবনে আমরা যখন প্রতিকূলতার সম্মুখীন হই, তখন আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ় মানসিকতাই আমাদের সবচেয়ে বড়ো সহায়। ভগিনী নিবেদিতা বলেছেনে, ‘ একটি জাতির উন্নতি নির্ভর করে সেই সমাজের মানুষের আত্মবিশ্বাস ও কঠোর পরিশ্রমের উপর। প্রকৃত শিক্ষা সেই-ই যা মানুষকে আত্মনির্ভরশীল করে তোলে।’

শিক্ষা যদি পরীক্ষার ফলাফলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তাহলে তা জীবনযুদ্ধে তা সহায়ক হয় না। বাস্তব জীবন পরীক্ষার ফলাফলের চেয়েও কঠিন, যেখানে কেবল বইয়ের তথ্যই যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন বাস্তব জ্ঞান, সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা ও আত্মবিশ্বাস। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও মনে করতেন, শিক্ষা কেবল তথ্য আহরণের মাধ্যম নয়, এটি জীবনকে বুঝতে শেখায় এবং আমাদের অভ্যন্তরীণ শক্তিকে জাগিয়ে তোলে। তিনি বলেছেন— ‘ শিক্ষা মানে কেবল পড়াশোনা নয়, বরং জীবন গঠনের এক মহান সাধনা।’

সুতরাং, শিক্ষা শুধু পুঁথিগত বিদ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। বরং এটি এমন হতে হবে যা ব্যক্তি, সমাজ ও মানবজাতির সামগ্রিক উন্নয়নে আবদান রাখে। প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো, ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটানো, আত্মবিশ্বাস নির্মাণ করা এবং জীবনের প্রতিটি চ্যালেঞ্জকে শক্ত হাতে মোকাবিলা করার শক্তি অর্জন করা। শিক্ষা যদি আমাদের ভীতু, দ্বিধাগ্রস্ত বা পরনির্ভরশীল করে তোলে, তবে তা প্রকৃত শিক্ষা নয়। শিক্ষা আমাদের শুধু জীবিকা অর্জনের জন্য নয়, বরং আত্মোন্নতি ও সমাজ কল্যাণের জন্য প্রস্তুত করে। তাই আমরা এমন শিক্ষা গ্রহণ করবো যা আমাদের আত্মবিশ্বাসী করে তোলে, মানসিক গুণাবলী বিকশিত করে এবং যেকোনো পরিস্থিতিতে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর শক্তি জোগায়, যাতে আমরা শুধু নিজের উন্নতির কথা না ভেবে সমগ্র সমাজের জন্য কাজ করতে পারি এবং জীবনের প্রতিটি চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে সক্ষম হই।

ধৃতি বর, অষ্টম শ্রেণী,
কালীকৃষ্ণ ঠাকুর রোড, আলমবাজার,
কলকাতা-৩৬।

জাতীয় উদ্যান

ইরাভিকুলাম

ইরাভিকুলাম জাতীয় উদ্যান কেরালার ইদুক্কি জেলার পশ্চিমঘাট পর্বতমালার পাশে সমুদ্র থেকে ৭০০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত। এটি রাজমালাই জাতীয় উদ্যান নামেও পরিচিত। উদ্যানের মূল অংশটি উঁচু ঢালু পাহাড়ি মালভূমি। উদ্যানের মধ্যে দিয়ে বেশ কয়েকটি ছোটো নদী প্রবাহিত হয়েছে। এই উদ্যান ৯৭ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। শোলাবন এবং ঢালু তৃণভূমি উদ্যানটিকে ঘিরে রেখেছে। নীলকুরিঞ্জি ফুল ও নালগিরি তাহের জন্তুটি এই উদ্যানের বিশেষ আকর্ষণ। এই উদ্যানে ২৬ প্রজাতির জীবজন্তু এবং ১২০ প্রজাতির গাছপালা রয়েছে। এই উদ্যান পরিদর্শনের আদর্শ সময় হলো সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর এবং এপ্রিল থেকে জুন মাস। ভেতরে রয়েছে আনামুদি শৃঙ্গ, আতুক্কাদ জলপ্রপাত,লাক্কম জলপ্রপাত, ইকো পয়েন্ট, ফরেস্ট রোজ গার্ডেন, মুন্নার, চিন্নার, ইদুক্কি অভয়ারণ্য প্রভৃতি দর্শনীয় স্থান।

এসো সংস্কৃত শিখি– ৬৭

कदा ?– কখন? समय: – সময়।

अभ्यासं कुर्म:

अहं पञ्चवादने उत्तिष्ठामि।

আমি পাঁচটার সময় উঠি।

अहं सपादपञ्चवादने दन्तधावनं करोमि।

अहं षठवादने पठामि।

अहं अष्टवादने स्वल्पाहारं स्वीकरोमि।

अहं नववादने स्नानं करोमि।

अहं दशवादने विद्यालयं गच्छामि।

अहं द्विवादने भोजनं करोमि।

अहं चतुर्वादने गृहं आगच्छामि।

अहं पञ्चवादने क्रीडामि।

अहं षटवादने पठामि।

अहं सप्तवादने दूरदर्शनं पश्यामि।

अहं नववादने खादामि.

अहं दशवादने निद्रां करोमि।

प्रयोगं कुर्म: –

भवान कदा उत्तिष्ठति ? भवान कदा दन्तधावनं करोति ?

ভালো কথা

আমার অনুভব

আমাদের বাড়িতে স্বস্তিকা পত্রিকা আসে। আমার বাবা নিয়মিত পাঠক। আমিও পড়তে শুরু করি। ধীরে ধীরে আমিও পাঠক হয়ে যাই। নবাঙ্কুর বিভাগটি আমার খুব ভলো লাগে। এটি ছোটোদের বিভাগ। পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রা-ছাত্রীরা এই বিভাগে অংশগ্রহণ করতে পারে। আমি লিখতে ভালোবাসি। প্রথম একটি লেখা পাঠিয়েছিলাম। সেটি মনোনীত হয়। ছাপার অক্ষরে নিজের লেখা গল্প দেখে আমার উৎসাহ বেড়ে যায়। নিয়মিত লিখতে থাকি। ছাপাও হতে থাকে। এভাবেই স্বস্তিকাকে আমি ভালোবেসে ফেললাম। হঠাৎ একদিন পত্রিকার সম্পাদকীয় দপ্তর থেকে আমাকে ফোনে জানানো হলো, এবার আমি নবাঙ্কুরের সেরা লেখিকা হিসেবে মনোনীত হয়েছি। নববর্ষ সংখ্যার প্রকাশ অনুষ্ঠানে আমাকে থাকতে হবে। শুনে আনন্দে আমি অভিভূত হয়ে গেলাম। আমি দিন গুনতে শুরু করলাম। অবশেষে সেই দিনটি এল।

গত এপ্রিল মাসের ১২ তারিখে বিকেলে আমি মা-বাবা আর ভাইয়ের সঙ্গে হাতিবাগানের আস্থা কমিউনিটি হলে পৌঁছালাম। পাঁচটায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হলো। তা শেষ হলে নববর্ষ সংখ্যার প্রকাশ অনুষ্ঠান শুরু হলো। বিশিষ্ট লোকেদের উপস্থিতিতে হল ভর্তি। পরিচয় পর্ব, স্বাগত ভাষণের পরেই আমার ডাক পড়ল। সঙ্গে মা-বাবাকেও। ঘোষণা হলো 'এবার নবাঙ্কুরের সেরা লেখিকা রূপসা রায়' শুনে আবার অভিভূত হয়ে গেলাম। হাততালিতে সভাকক্ষটি মুখরিত হয়ে উঠল। বিশিষ্ট লেখিকা ডঃ দেবযানী ভট্টাচার্য আমাকে উত্তরীয় পরিয়ে দিয়ে পুষ্পস্তবক হাতে দিলেন। আর এক বিশিষ্ট লেখিকা ডঃ রাজলক্ষ্মী বসু একটি মিষ্টির প্যাকেট ও সত্যজিৎ রায়ের 'গল্প ১০১' বই হাতে দিলেন। উপস্থিত দর্শকাসনে তখন আবার হাততালি। আমাকে এভাবে উৎসাহিত করায় আমার মন আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল। অনুষ্ঠান শেষে অনেকের সঙ্গে পরিচয় হলো।

আমি স্বস্তিকা পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলীর কাছে কৃতজ্ঞ যে তাঁরা আমাকে যোগ্য মনে করেছেন। এত বড়ো অনুষ্ঠানে এই উৎসাহদান আমাকে নবাঙ্কুরের বন্ধুদের জন্য আরও ভালো ভালো লেখায় উৎসাহিত করবে।

রূপসা রায়, দশমশ্রেণী, লেক টাউন, কলকাতা-৪৮

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

লেখা পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা ই-মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪

৯০৫১৭২১৪২০

PIONEER®

EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.

74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0556, Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com, www.pioneerpaper.co

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

- ★ RETIREMENT PLANNING.
- ★ CHILDREN EDUCATION FUND.
- ★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
- ★ WEALTH CREATION.
- ★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT 8240685206 9748978406

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

একটি মেয়ের কুড়িটি চিঠি

মৃত্যুপুরীর সঞ্জীবনী

একটি মেয়ে ৩৭ বছর বয়স। এখন সে পরিণত। এটা বুঝতে পারার জন্য যে মাত্র ৬ মাস বয়সে যখন সে মাতৃহারা হয়, যখন তার মায়ের ৩১ বছর বয়স। কী মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে কষ্ট পাচ্ছিল তাঁর মা। তিনি মুক্তি পেতে চেয়েছিলেন আর শাস্তি দিতে চেয়েছিলেন তাঁর স্বামী সেই দেশের সবথেকে শক্তিশালী মানুষটিকে। সেই মানুষটি এই ৩৭ বছরের মেয়েটির বাবা সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বাধিনায়ক জোসেফ স্ট্যালিন।

দ্বিতীয় পর্ব

পিন্টু সান্যাল

নিজেকে সোভিয়েত রাশিয়ার একনায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে স্তালিন একে একে তার এক সময়ের সঙ্গীদের সরাতে থাকেন। স্তালিনের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ব্যর্থতার দায় দেওয়া হয় বিভিন্ন দপ্তরের সরকারি আধিকারিক, পার্টির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী, বিভিন্ন লেখক, ইঞ্জিনিয়ার, যৌথ খামারের ম্যানেজারদের উপর। 'দি গ্রেট পার্জ' বা শুদ্ধীকরণের নামে সমাজের সর্বস্তরে নেমে আসে স্তালিনের দণ্ডাদেশ— হাজার হাজার কিলোমিটার দূরের গুলাগ ক্যাম্পে নির্বাসন বা গুলি করে হত্যা।

এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ব্যর্থতার প্রভাব স্তালিনের দাম্পত্য জীবনেও পড়েছিল আর তারই জমে ওঠা বিষবাষ্প তাঁর মা-কে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করেছিল, এমনটাই মত শ্বেতলানার। শ্বেতলানার মাতামহ সের্গেই আলিলুয়েভা ছিলেন একজন রেলওয়ে কর্মী। তিনি বলশেভিক আন্দোলনের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। তথাকথিত বিপ্লবের পূর্বে ভ্লাদিমির লেনিন এবং জোসেফ স্তালিন-সহ অনেক বলশেভিককে তাঁদের পরিবার আশ্রয় ও সহায়তা দিয়েছিল। সেই সূত্রেই শ্বেতলানার মায়ের সঙ্গে স্তালিনের প্রেম ও বিয়ে।

১৯৩১-এ নাদেঝদা'র বয়স ৩১। রসায়ন বিভাগের এক নতুন শাখা 'সিন্থেটিক ফাইবার' নিয়ে পড়াশোনা করছেন 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাকাডেমি'-তে। নাদেঝদা কখনোই চায়নি সোভিয়েত রাশিয়ার 'ফার্স্ট লেডি' হতে। খুব সাধারণ ছিল তাঁর চাওয়া— অন্য দুই বান্ধবীর মতোই একজন টেক্সটাইল বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করবেন। স্তালিনের থেকে ২২ বছরের ছোটো, স্তালিনের প্রথম স্ত্রীর ছেলে ইয়াকভের থেকে মাত্র ৭ বছরের বড়ো শ্বেতলানার মা। ১৯২৮ সালে ইয়াকভ আত্মহত্যার চেষ্টা করলে তাকে মানসিক শক্তি জোগান তার বিমাতা কিন্তু নিজের ছেলের প্রতি স্তালিনের শ্লেষ— 'Ha! He couldn't even shoot straight!' ('হাঃ! ও সোজাসুজি একটা গুলিও করতে পারল না!')

স্তালিনের সমস্ত ব্যর্থ সম্পর্কের খামতিগুলো ভরাট করার দায়িত্ব শ্বেতলানার মায়ের। ইয়াকভের আত্মহত্যার চেষ্টা হয়তো নাদেঝদাকেও স্তালিনের রাজনৈতিক লক্ষ্য ও ব্যক্তিগত সম্পর্কগুলোর প্রতি তৈরি হওয়া এক অস্বাভাবিক পরিবেশ থেকে মুক্তির পথ দেখিয়েছিল। মায়ের স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে শ্বেতলানা লিখেছেন— 'ইয়াকভের শরীরে গুলির সেই আঘাতটি তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করে। পরবর্তীকালে তাঁর মৃত্যুও হয়তো ছিল সেই গুলিটির শব্দেরই প্রতিধ্বনি। ইয়াকভ আমায় এবং আমার মায়ের অভিভাবকদের খুবই ভালোবাসতো। আমার মাকে তো সে খুবই ভালোবাসতো ও শ্রদ্ধা করত।'

শ্বেতলানা তাঁর মাসি অ্যানা রেডেন্স-এর থেকেও সত্য খোঁজার চেষ্টা করেছেন— 'সম্প্রতি আমার মায়ের বোন অ্যানা আমায় বলেছেন যে তাঁর জীবনের শেষ বছরগুলিতে বাবাকে ছেড়ে চিরতরে চলে যাওয়ার বিষয়টি অত্যন্ত গভীরভাবে চিন্তা করতেন আমার মা। আমার মাসিমা অ্যানা প্রায়ই আমায় বলতেন যে বাবার কারণে দীর্ঘদিন ধরে নানা যন্ত্রণা সহ্য করে শেষপর্যন্ত প্রাণত্যাগ করেন আমার মা। বাবা ছিলেন অত্যন্ত নির্মম ও কঠোর। মায়ের মনে বাবার প্রতি নিখাদ প্রেম ও ভালোবাসা থাকলেও মায়ের ইচ্ছা ও অনুভূতির কোনো মূল্য বাবার কাছে ছিল না। এই কারণে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন আমার মা।'

খুব সাধারণ জীবনযাপন চেয়েছিল নাদেঝদা (Nadezhda

ফঃ ৬

Sergeyevna Alliluyeva)। নিজের অল্প বয়সের প্রেমের সুন্দর পরিণতি চেয়েছিল। কিন্তু মার্কসবাদে দীক্ষিত এক বলশেভিক স্বৈরাচারীর সঙ্গে ঘরবাঁধা কতটা কঠিন তার প্রমাণ রেখে গেছেন নাদেঝদা। শ্বেতলানার বাড়ির নার্স, রক্ষী সবার বক্তব্য মিলে যায় নাদিয়ার বান্ধবী পলিনা মলোটভের সঙ্গে। স্তালিন পলিনা মলোটভকে কাজাখস্তানে নির্বাসনে পাঠিয়েছিল। ১৯৫৫ সালে ফিরে এসে সে শ্বেতলানাকে জানায়— 'তোমার বাবা তাঁর সঙ্গে খুবই ভয়ংকর আচরণ করতেন। তার সঙ্গে তিনি একটি অত্যন্ত কঠিন জীবন যাপন করতেন। সকলেই এই সম্পর্কে জানত।'

মার্কসবাদ বলে, পরিবার হচ্ছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার একটা রূপ। কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতি অনুযায়ী পরিবার হলো সমাজের ক্ষুদ্রতম একক। ভালো পরিবারের সমষ্টি দিয়েই ভালো সমাজের নির্মাণ হয়। স্তালিন সোভিয়েত রাশিয়াকে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ল্যাবরেটরি করতে গিয়ে পুরো সমাজকে যেমন ক্ষতিগ্রস্ত করেছেন, তার নিজের পরিবার সেই আঘাত সমানভাবে সহ্য করেছে। স্তালিনের স্বৈরাচারী মনোভাব শুধু সরকার চালানোর ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, স্বৈরতন্ত্রের শিকার হয়েছে তার পরিবার ও পরিচিতদের সকলেই।

স্তালিনের সঙ্গে বিয়ের পর সহজ-সরল নাদেঝদার জীবনে বিপ্লব, গৃহযুদ্ধ ইত্যাদি বিষয়ের গুরুত্ব বেড়ে যায় শুধুমাত্র তাঁর ভালোবাসার মানুষটির টানে। তথাকথিত অক্টোবর বিপ্লবের পর থেকে সোভিয়েত রাশিয়ায় যেমন বদল শুরু হয়েছিল, নাদেঝদাও স্কুলের ছাত্রী থেকে স্তালিনের দ্বিতীয় স্ত্রী রূপে পরিবর্তিত হলেন।

স্তালিন-নাদেঝদার জীবনের বৈপরীত্য বোঝাতে গিয়ে শ্বেতলানা বলেছেন— 'সে তার ভাগ্যটাকে তার সঙ্গে জুড়ে দিল, যেন একটি ছোট্ট পালতোলা নৌকা বিশাল সমুদ্রগামী স্টিমারের আকর্ষণে এগিয়ে যাচ্ছে। এভাবেই আমি তাদের দেখি— উত্তাল মহাসাগরে পাশাপাশি এগিয়ে চলেছে। কিন্তু কতক্ষণ সেই ছোট্ট নৌকাটি সমুদ্রগামী জাহাজের সঙ্গে তার মিলিয়ে চলতে পারবে? তা কি প্রচণ্ড ঢেউ সামলে টিকে থাকতে পারবে, নাকি এমন তরঙ্গের আঘাতে উলটে যাবে, যা সেই বিশাল জাহাজের কাছে কিছুই নয়?'।

সেই ছোট্ট পালতোলা জাহাজটি সত্যিই উলটে গিয়েছিল, স্তালিনের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সুনামিতে। কত পরিবার ভেসে গিয়েছিল, কত শিশু মাতৃহারা-পিতৃহারা হয়েছিল, কত নিরপরাধ মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল কমিউনিজমের নামে।

স্তালিনের জীবদ্দশায় তার জীবন কখনোই স্বাভাবিক ছিল না, নিজের পিতার মৃত্যুর পর তার জীবন থেকে যেন পাথর সরে গিয়েছিল, সে যেন মুক্তভাবে শ্বাস নিতে পেরেছিল— এ কথা কমিউনিস্টদের নায়ক স্তালিনের নিজের মেয়ের কথায়—

'এক কথায়— বাবা যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন আমার জীবনও স্বাভাবিক থাকতে পারত না। বর্তমানে আমি যতখানি স্বাধীন, ততখানি স্বাধীনতা কি আগে কোনোভাবে আমি পেতাম? অনুমতি ছাড়া ইচ্ছামতো যেকোনো জায়গায় যেতে পারতাম? আমার পছন্দের কারও সঙ্গে দেখা করতে বা বন্ধুত্ব করতে পারতাম? আমার সন্তানেরা স্বাধীনভাবে বেড়ে উঠেছে। তারা কি এখনকার মতো কোনো নজরদারি ছাড়া স্বাধীনভাবে বাঁচতে পারত? এখন আমরা সকলে স্বাধীনভাবে শ্বাস নিতে পারি। আজ যেন আমাদের বুকের উপর থেকে একটি জগদ্দল পাথর সরে গিয়েছে।'

সোভিয়েত রাশিয়ার বুক থেকে স্তালিন নামক পাথর সরার আগে লক্ষ লক্ষ কৃষক অনাহারে মরেছে, সমাজের সর্বস্তরের মানুষ মৃত্যুভয়ে শঙ্কিত থেকেছে সবসময়। শ্বেতলানার আত্মকথায় সেই অজানা অচেনা মানুষদের প্রতিও সমবেদনা উঠে এসেছে আর উঠে এসেছে আলিলুয়েভা পরিবারের প্রত্যেকের করুণ পরিণতির কথা যার জন্য দায়ী তাঁর পিতা স্তালিন।

এত প্রিয়জনের মৃত্যুর বর্ণনা দিতে দিতে যে নিজেই মানসিক ভারাক্রান্ত। তিনি পাঠকদের জানাচ্ছেন— 'তুমি সম্ভবত এখন ক্লান্ত, বন্ধুবর, আমি যে অগণিত মৃত্যুর কথা তোমাকে বলে চলেছি তা শুনতে শুনতে। আমি কি একটাও এমন মানুষকে চিনতাম যার জীবন ভালোভাবে কেটেছে? যেন আমার বাবা এক অন্ধকার বৃত্তের কেন্দ্রে ছিলেন, আর যে কেউ সেই বৃত্তের ভেতরে প্রবেশ করলেই হারিয়ে যেত, মারা যেত বা কোনো না কোনোভাবে ধ্বংস হয়ে যেত'। শ্বেতলানার স্মৃতিকথা প্রকাশিত হওয়ার এত বছর পরেও কমিউনিস্ট নামে পরিচিত কিছু মানুষ দাবি করেন এই কালো বৃত্তের মাঝখানে থাকা মানুষটিই নাকি পৃথিবীকে সাম্যবাদের দিশা দিতে পেরেছে।

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693

IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে কঠোরতম শাস্তি হওয়া চাই

রঞ্জন কুমার দে

'যদি তুমি ধর্মের দোহাই দিয়ে মানুষকে ঘৃণা করতে শেখাও, তবে সেই ধর্ম তোমার নয়, অসুরের।' —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'পথ ও পাথেয়' ১৯১৫। রবীন্দ্রনাথ হয়তো সেই শতাব্দীতেও সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে আক্রান্ত হয়েছিলেন কোনোভাবেই। সেই ট্রেডিশন এখনো চলছে। কাশ্মীরকে পৃথিবীর ভূস্বর্গ বলা হয়, তাই ভারতীয় ভ্রমণ পিপাসুদের প্রথম পছন্দ কাশ্মীর। সম্প্রতি কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে নৃশংস জেহাদি হামলা শেষে সবাই বলা শুরু করছে কাশ্মীর ভ্রমণে প্রথম জরুরি 'কলমা মুখস্থ করা'। কারণ পহেলগাঁওয়ে জেহাদিদের একে-৪৭-এর সামনে জীবন-মরণের ব্যবধানে ছিল মাত্র এই 'কলমা মুখস্থের যোগ্যতা'। এই জঙ্গিদের কাছে নিরস্ত্র পর্যটকদের হত্যার জন্য প্রথম মাপখাঠি ছিল ধর্মীয় পরিচয়, তাদের উদ্দেশ্যে ছিল না কোনো মুসলমানকে হত্যা করা। তাই তারা প্রয়োজনে পুরুষ পর্যটকদের প্যান্ট খুলে দেখে নিশ্চিত হয়েছিল সেখানে বিশেষ সেই ছেদ রয়েছে কিনা।

পহেলগাঁওয়ে হিন্দু হওয়ার অপরাধে যে হত্যালীলার বধ্যভূমি সৃষ্টি করে তুমুল হিন্দুদ্বেষের বার্তা দেওয়া হলো সেটা নতুন কিছু নয়, যদিও প্রতিবার বিভিন্ন দলিলে সেটাকে কেবল রাজনৈতিক রং দেওয়া হয়েছিল। কাশ্মীরকে পৃথিবীর ভূস্বর্গ আখ্যা দেওয়া হলেও সেটা শুধু কাশ্মীরি পণ্ডিতদের নয় বরং পুরো হিন্দু জাতির জন্য একটা অভিশাপ। নিজ দেশের অঘোষিত একটি নিষিদ্ধ রাজ্য। ১৯৯০ সালের অভিশপ্ত ১৯ জানুয়ারি কাশ্মীরের বিভিন্ন মসজিদ থেকে কাশ্মীরের ভূমিপুত্র পণ্ডিতদের উদ্দেশ্যে খোলা চিঠি বেঁধে দেওয়া হয়েছিল যে এরা কাফের, তাই তাঁদের কাশ্মীর ছাড়তে হবে নতুবা ইসলাম গ্রহণ করতে হবে, অন্যথায় শুধু হত্যা। পরবর্তীতে আমরা হিন্দুবিদ্বেষের সেই বীভৎস রূপ দেখেছিলাম, যেটা কিছুদিন আগে চলচ্চিত্র নির্মাতা বিবেক অগ্নিহোত্রীর 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস্' সিনেমায় কিছুটা চিত্রায়িত করেছেন যার জন্য মোল্লাবাদী শক্তি, বামপন্থী, তথাকথিত সেকুলারদের কাছে তাঁকে চক্ষুশূলও হতে হয়েছে।

আমরা যদি বৃহত্তর কাশ্মীরি পণ্ডিতদের সেই নিধনযজ্ঞ বাদও দিই, তবুও সেটা সেখানে থেমে না থেকে ইসলামি কট্টরপন্থী জেহাদিরা কাশ্মীরে সুনির্দিষ্ট ধারাবাহিকতায় তাদের উদ্দেশ্যে আরও সুনিশ্চিত করছে। একটি সমীক্ষায় উঠে এসেছে, বিগত ৩২ বছরে পাকিস্তানের মদতে ৫৬ হাজার জেহাদি হামলা হয়েছে কাশ্মীরে। এটা কি কখনো ভাবা যায় যে কোনো দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজ তাঁরা তাঁদের নিজ দেশে পুণ্যস্থল দর্শন নিজের জীবনের মূল্যের বিনিময়ে করতে হবে। হ্যাঁ, এটাই হয়েছে বারবার অমরনাথ যাত্রী পুণ্যার্থীদের সঙ্গে। ১৫ আগস্ট ১৯৯৩ সালে অমরনাথ মন্দিরে যাওয়ার পথে তাঁদের দলে আক্রমণ করে ৮ জন পুণ্যার্থীদের হত্যা করে জেহাদিরা। ২ আগস্ট ১৯৯৪ সালে পহেলগাঁওয়ে যাত্রা বাসক্যাম্পে হামলায় ৫ জন তীর্থযাত্রী নিহত ও বেশ কয়জন আহত হন। ২৮ জুলাই ১৯৯৮ সালে একই কায়দায় পুণ্যার্থীদের আশ্রমস্থলে আক্রমণ করে ২০ জনকে হত্যা করা হয়। ২ আগস্ট ২০০০ সালে সেই পহেলগাঁওয়ে বেস ক্যাম্পে হামলায় ২১ জন তীর্থযাত্রী-সহ মোট ৩২ জন নিহত ও ৬০ জন আহত হন। ২০ জুলাই ২০০১ সালে অমরনাথ তীর্থযাত্রীদের উপর গ্রেনেড হামলা এবং নির্বিচারে গুলি চালিয়ে ১৩ জন পুণ্যার্থীদের বাসে গ্রেনেড হামলায় ৫ জন নিহত হন। ১০ জুলাই ২০১৭ সালে

কাশ্মীরে এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন হওয়া উচিত যে স্থানীয়রা এইরকম জঙ্গিকাণ্ডে জড়িত হওয়ার আগে ১০ বার ভাববে, অন্যতায় কাশ্মীরে এই ধারাবাহিক রক্তক্ষরণ থামানো সম্ভব নয়।

কাশ্মীরের অনন্তনাগের কাছে বোতেঙ্গা গ্রামে জঙ্গিরা পুণ্যার্থীদের বাসে হামলায়, ৭ জন নিহত ও ১৫ জন আহত হন।

একইভাবে ২০২২ সালের মে মাসে বৈষ্ণোদেবী মন্দিরের পুণ্যার্থীদের বাসে বোমা মেরে ৪ জন নিহত ও ২৪ জনকে আহত করা হয়। ২০২৪ সালের ৯ জুনে কাশ্মীরি জঙ্গিদের আক্রমণে পুণ্যার্থীদের বাস খাদে পড়ে অন্ততপক্ষে ১০ জন নিহত ও ৩৩ জন আহত হন। ২০২৫ সালের অমরনাথ যাত্রার আগেই পহেলগাঁওয়ে জঙ্গিরা হত্যালীলা চালিয়ে তাদের হিন্দুদের প্রতি জেহাদের আগাম বার্তা স্পষ্ট করলো। এতগুলো সন্ত্রাবাদী ঘটনা ছাড়াও সময়ে সময়ে সেখানের স্থানীয় কাশ্মীরি পণ্ডিত, শিখ সম্প্রদায়-সহ সেনাচৌকিতে আক্রমণ চালিয়ে অগণিত হত্যালীলা চালানো হয়েছে শুধুমাত্র হিন্দুদের মনে ভীতি সঞ্চার করা এবং কাশ্মীর উপত্যকাকে হিন্দুশূন্য করা।

প্রতি বছর ভারত থেকে হজ উমরা পালন করতে হাজারো মুলসলমান সৌদিআরবে পাড়ি দেন। ভারতীয় সংখ্যালঘু

মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তাদের যাবতীয় ট্রেনিং, সংবর্ধনা প্রভৃতির পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু ভারতের জম্মু-কাশ্মীরের অমরনাথ, বৈষ্ণোদেবী মন্দিরের হিন্দু পুণ্যার্থীরা এত দুর্ভাগা কেন যে প্রায় প্রতি বছর তাঁদের প্রাণ দিয়ে পুণ্যার্জনের মাশুল দিতে হয়। আজ যারা 'কলমা'র সঙ্গে মোল্লাবাদী কানেকশন খুঁজে পাচ্ছেন না, তারা নিশ্চয় অমরনাথ যাত্রার হুতাত্মাদের পাতা উলটে দেখবেন একটু। যারা পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলায় সুস্পষ্ট হিন্দুদের টার্গেটে কিলিং এবং জঙ্গি আক্রমণের সূত্রতা যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও অস্বীকার করছেন। তারা সামান্য বিচ্ছিন্ন ঘটনায় হিন্দুত্বে গেরুয়া সন্ত্রাসের ট্যাগ লাগিয়ে দেন। হজ পালন, কলমা চর্চা নিঃসন্দেহে মুসলমানরা নির্ভয়ে করে থাকেন, কিন্তু হিন্দু পুণ্যার্থীদের অমরনাথ যাত্রায় ইসলামি সন্ত্রাসবাদীদের কীসের এত সমস্যা! কেন কলমা না জানলেই তাকে হত্যা করা হবে! কীসের এত হিন্দু বিদ্বেষ?

কলমা তো ইসলামে মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও বিশ্বাসের জায়গা। এই কলমায় ৬টি বাক্যগুচ্ছ রয়েছে যা তারা নিজের ভেতরের বিশ্বাসকে আরও মজবুত করতে সেটাকে চর্চা করেন। বিশ্বাসের জন্য প্রথম ২টি, তৃতীয় ও চতুর্থটিতে আল্লার গুণগান, পঞ্চম ও ষষ্ঠটিতে আল্লার কাছে দয়া, করুণা ও ক্ষমা প্রার্থনা। এই ষষ্ঠ কলমাটি হলো কলমা রাদ-ই-কুফর, অর্থাৎ উপজীব্য অবিশ্বাস পরিত্যাগ করা ও আল্লার কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা। কোনো অমুসলমানকে যখন ধর্মান্তরিত করা হয় তখন এই ষষ্ঠ কলমা পড়ানো হয়। এই কলমা সাধারণ কোনো মুসলমানের অজানার কিচ্ছু নয়। তাই জেহাদিরা এই রকম জেনোসাইড হত্যাকাণ্ডের আগে কলমা টেস্ট করে নেয়। ২০১৬-তে ঢাকায় হলি আর্টিজান ক্যাফে একই রকম হামলায় প্রায় ২৮ জনকে জবাই করে হত্যা করা হয়, এর মধ্যে ৭ জন মুসলমানও ছিলেন, কারণ তারা সেই কলমা পাঠ করতে পারেননি। পহেলগাঁওয়ের জঙ্গিদের প্রথম থেকেই স্থানীয় কাশ্মীরিদের যোগসাজেস লক্ষ্য করা যাচ্ছিল, এখন পাকাপোক্তভাবে প্রমাণিত। কুখ্যাত এই জঙ্গিকাণ্ডের দায় স্বীকার করে নিয়েছে পাকিস্তানভিত্তিক জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তৈবার ছায়া সংগঠন দ্য রেজিস্ট্যান্স ফোর্স। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা এজেন্সির সূত্রমতে জঙ্গিদের এই টিমে পাকিস্তানিদের সঙ্গে স্থানীয় কাশ্মীরের ৫ থেকে ১৫ জন সদস্য যুক্ত ছিল এবং তাদের মূল সর্দার ছিল স্থানীয় স্কুল শিক্ষক আদিল যে পাকিস্তান গিয়ে জঙ্গি ট্রেনিং নিয়ে এসেছিল। এদের থাকা খাওয়ার সম্পূর্ণ জোগান দিচ্ছিল এই স্থানীয়রাই।

প্রাথমিক অ্যাকশনে চিহ্নিত এই জঙ্গিদের বাড়িঘরে প্রশাসন বুলডোজার চালাচ্ছে, পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে সারা দেশে অবৈধদের ধরপাকড় চলছে ইত্যাদি। এই পদক্ষেপগুলি সঠিক। কিছুদিন আগেও পুলওয়ামা বিস্ফোরণে একই চিত্র ফুটে এসেছিল। প্রতি বছর অমরনাথ যাত্রায় হিন্দু পুণ্যযাত্রীদের সঙ্গে ঘটে প্রাণনাশের হামলা। এর একটা শেষ হওয়া প্রয়োজন। কাশ্মীরের ট্যুরিজমের দোহাই দিয়ে আর কত হিন্দুদের বলি চড়াতে হবে? প্রত্যেকটি জঙ্গিকাণ্ডে উঠে আসে কাশ্মীরিদের যোগসাজেস। তাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদত ছাড়া কোনোভাবেই পাকিস্তানি জঙ্গিদের এই রকম নৃশংস অপারেশন ঘটানো সম্ভবপর নয়। আগে উত্তর-পূর্ব ভারতেও বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের বেশ বাড়বাড়ন্ত ছিল, কিন্তু এখন স্থানীয়রা এদের প্রতি মুখ ফিরিয়ে নেওয়ায় তাদের বাড়া ভাতে ছাই পড়েছে। নিঃসন্দেহে পহেলগাঁও জঙ্গিকাণ্ডে রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের যথেষ্ট কামতি ছিল যে কীভাবে জঙ্গিরা সহজে বর্ডার পার করে ভারতে ঢুকে যায়, স্পর্শকাতর এই রকম এলাকায় কোনো সিকিউরিটি ব্যবস্থা নেই, ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি পুরো ফেল ইত্যাদি।

অবশ্য উভয় সরকার তাঁদের দায় স্বীকারও করে নিয়েছে কিন্তু এটা যথেষ্ট নয়। কিছুদিন আগে একই রকম কাপুরুষতার কাজ করেছিল ইজরায়েলে হামাসের জঙ্গিরা। ইজরায়েল কড়া হাতে এই জঙ্গিদের শায়েস্তা করে গাজাভূখণ্ড ধুলায় মিশিয়ে দিয়েছে। তাই বারবার যদি আমরা স্থানীয় কাশ্মীরিদের যোগসাজসে পেয়েও এভাবে তাদের ছাড় দিয়ে দিই তাহলে এরকম হত্যাকাণ্ড ঘটেই চলবে। আজ গাজায় প্রকাশ্যে স্থানীয়রা রাস্তায় নেমে হামাসের বিরোধিতা করছে, এরকম এই প্রথম হলো। তাই কাশ্মীরেও এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন হওয়া উচিত যে স্থানীয়রা এইরকম জঙ্গিকাণ্ডে জড়িত হওয়ার আগে ১০ বার ভাববে, অন্যতায় এই ধারাবাহিক কাশ্মীরে রক্তক্ষরণ থামানো সম্ভবপর নয়। □

শোক সংবাদ

দুর্গাপুর নগর সঙ্ঘচালক অশোক কুমার বোরার গত ২৮ মার্চ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ২ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। শ্রীবোরার রাজস্থান থেকে ব্যবসাসূত্রে দুর্গাপুরে আসেন এবং সঙ্ঘকাজের সঙ্গে যুক্ত হন।
তিনি ধীরে ধীরে বিভিন্ন দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করার পর দুর্গাপুর নগর সঙ্ঘচালকের দায়িত্ব পালন করেন। সঙ্ঘের দায়িত্ব ছাড়াও তিনি বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের দায়িত্বও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন।

* * *

আসানসোল জেলার অণ্ডাল খণ্ড সঙ্ঘচালক শুকদেব প্রসাদ বর্ণওয়াল গত ২১ এপ্রিল পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। উল্লেখ্য, উখড়া খণ্ডে তাঁর হাত দিয়েই সঙ্ঘের কাজ শুরু হয়। বিগত শতাব্দীর সত্তরের দশকে উখড়া খণ্ডের ১৪টি শাখার তদারকি তিনি সাইকেলে ঘুরে ঘুরে করতেন।

* * *

উত্তর ২৪ পরগনা বিভাগের প্রয়াত বিভাগ সঙ্ঘচালক প্রণব কুমার মৈত্রর সহধর্মিণী গৌরী মৈত্র গত ২৬ এপ্রিল পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। তিনি ১ কন্যা ও নাতি-নাতনি রেখে গেছেন।

বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার ইঙ্গিতে বাড়ছে উদ্বেগ

অর্ণব কুমার দে

সম্প্রতি বিশ্ব জুড়ে অর্থনৈতিক মন্দা ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। বিশ্বে এই অর্থনৈতিক মন্দা গত শতাব্দীতেও দেখা গেছে। অর্থনীতির সঙ্গে রাজনীতি অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত, তাই এই মন্দার প্রভাব সমাজে প্রতিফলিত হলেই রাজনৈতিক টানাপোড়েন শুরু হয়। প্রথমে বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরে এর প্রভাব দেখা যায়, আর বিশ্বায়নের যুগে অন্য দেশও জড়িয়ে পড়ে। তবে যেকোনো একটি দেশ, অর্থনৈতিক মন্দায় পড়লে আজকের বিশ্ব অর্থনীতিতে খুব সমস্যা সৃষ্টি করে না। এই দশকেই গ্রিস অর্থনৈতিক মন্দায় পড়লেও ইউরোপীয় ইউনিয়ন তাকে সামাল দিয়ে দেয়। কিন্তু সমস্যা হয় যখন বিশ্বের অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী বেশ কিছু দেশ এক সঙ্গে মন্দার শিকার হয়। বর্তমানে ফের সেরকম সম্ভবনার উদয় হয়েছে। আসুন দেখে নেওয়া যাক কী ধরনের বিপদ আসন্ন।

একটি দেশের অর্থনীতির সার্বিক অবস্থা সেই দেশের ম্যাক্রো-অর্থনীতি দিয়ে বোঝা যায়। কিন্তু এই ম্যাক্রো-অর্থনীতির শিকড়ে থাকে মাইক্রো-অর্থনীতি। তাই সেখান থেকেই বুঝতে হবে বড়ো চিত্রটি কীরকম। বিশ্বে এখন প্রায় আটশো কোটির বেশি লোক বসবাস করে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি এই অর্থনৈতিক মন্দা সৃষ্টির মূল কারণ। মানুষের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনের বৃদ্ধি ঘটে। ছোটোবেলার সেই পাটিগণিতের অঙ্ক, এক ব্যক্তি একটি কাজ দশদিনে করলে, পাঁচ ব্যক্তি কতদিনে করবে? ঠিক সেই তত্ত্বে মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধি, উৎপাদন বাড়িয়ে তোলে। কিন্তু অর্থনীতিতে আরও একটি তত্ত্ব রয়েছে— ল' অব ডিমিনিশিং রিটার্ন, যে তত্ত্বের ফাঁদে পড়ে বিশ্ব এই আর্থিক মন্দার কবলে পড়েছে।

ল' অব ডিমিনিসিং রিটার্ন তত্ত্বটি হলো, এক বিঘা জমির উপর একের জায়গায় পাঁচজন কাজ করলে উৎপাদন বেশি হয়, কিন্তু লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটালে বৃদ্ধির হার কমতে থাকে। একটা ফ্যাক্টরিতে একশো লোকের বদলে তিনশো লোক নিযুক্ত করলেই বেশি উৎপাদন হবে না, উলটে ফ্যাক্টরিতে লাভ হ্রাস পাবে, কারণ বেশি কর্মীর সম্মিলিত বেতন লভ্যাংশে ভাগ বসাবে। আর একটি দিক হলো consumption বা ক্রয় ক্ষমতা, যার কিনা একটি সীমা আছে। ক্রয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত হলো বিক্রয়, তারও একটি স্যাচুরেশন আছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যেমন উৎপাদন বৃদ্ধি হয়েছে, তেমনি একই কাজে বহু সংস্থা থাকায় তাদের সংস্থার লভ্যাংশের হ্রাস ঘটেছে। সেই লভ্যাংশ বাড়াতে বিজ্ঞাপনের খরচ বেড়েছে, তাতে আরেক প্রস্থ লভ্যাংশের হ্রাস পেয়েছে। সেই খরচ মেটাতে মূল্য বৃদ্ধি করতে হয়েছে আর তার ফলে বাজার দর চক্রাকারে বৃদ্ধি পেয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ রাসায়নিক দ্রব্যের দাম বৃদ্ধিতে, সার প্রস্তুতকারী সংস্থার উৎপাদনের খরচ বেড়েছে, তার ফলে কৃষক বেশি দামে সার কিনতে বাধ্য হয়েছে। কৃষকের ফসল উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে, সেই উৎপাদিত ফসল কিনতে গিয়ে রাসায়নিক ফ্যাক্টরির কর্মীকে বেশি দাম দিতে হয়েছে, ফলস্বরূপ সে বেতন বৃদ্ধির দাবি করেছে। এভাবেই বাজার চক্রবৃদ্ধিহারে অগ্নিমূল্য হয়ে ওঠে।

এভাবে চললে অসুবিধা কোথায়? সমস্যা হলো মানুষের জন্মানোর হার হয় জ্যামিতিক অগ্রগতিতে অর্থাৎ ২, ৪, ৮ অনুপাতে। কিন্তু কৃষি উৎপাদনের হার গাণিতিক অগ্রগতিতে বাড়ে যেমন ১, ২, ৩। শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদনের হার গণনার ক্ষেত্রে রয়েছে একটি সূচক— 'ইনডেক্স অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন'। শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়টি জনসংখ্যা বা কৃষি উৎপাদন হারের মতো নির্দিষ্ট নয়। শিল্প উৎপাদন কত শতাংশ বৃদ্ধি বা হ্রাস পেল তা প্রতি বছর গণনা করা হয়ে থাকে। আজকের যুগে স্বয়ংক্রিয় মেশিনারির ফলে উৎপাদনের হার বেড়েছে কিন্তু তাতে শ্রমিক নিযুক্তির হার কমেছে। তাই পরিবার পিছু বা মাথা পিছু ক্রয়ক্ষমতা সেই অনুপাতে বাড়ে না। এই কারণে বামপন্থীরা নাকি কম্পিউটারের বিরোধিতা করেছিল। সে যুক্তির প্রতিযুক্তি হলো তাহলে বৈদ্যুতিক সংযোগ না করে রাস্তার লাইট জ্বালাতে একটি করে লোক নিয়োগ করলেই ভালো। বস্তুত বিজ্ঞান কখনো থেমে থাকে না, বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ঘটতে থাকে নিরন্তর। বিজ্ঞান অনবরত এগিয়ে যেতে থাকে। আর তার ভালো-খারাপ নির্ভর করে ব্যবহারকারীর উপর। আর একটি দিকে ওই বামপন্থীরা বলবেন পুঁজিবাদীরা সব লভ্যাংশ নিয়ে নেওয়া ও পুঁজিবাদী সরকার তাতে মদত দেওয়ার জন্য এই মন্দা সৃষ্টি হয়েছে। সে যুক্তি খুব সঙ্গত নয়। একটা উদাহরণ দেখা যাক। এক কৃষকের এক বিঘা জমির উৎপাদন যদি তার চার পুত্রের ভিতর ভাগ হয় তাহলে কোনো পুঁজিপতির শোষণ ছাড়াও সেই পুত্রদের উপার্জন এক-চতুর্থাংশে নেমে যায়। আর এটাও দেখা গেছে সোভিয়েত রাশিয়ার ৭৪ বছরের বামপন্থা-নির্ভর অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে, তাই পুঁজিবাদী অর্থনীতি আর পুঁজিপতি তত্ত্ব যে খুব গ্রহণযোগ্য, তা বলা যায় না।

পৃথিবীতে অর্থনৈতিক সংকটের মূল কারণ হলো— জনসংখ্যার বিস্ফোরণ এবং বিভিন্ন শিল্পে প্রবল প্রতিযোগিতা। সে কারণেই আজ বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

পৃথিবীতে এখন এই অর্থনৈতিক সংকটের মূল কারণ হলো— জনসংখ্যার বিস্ফোরণ এবং বিভিন্ন শিল্পে প্রবল প্রতিযোগিতা। সে কারণেই আজ বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। বিগত তিরিশ বছরে বিভিন্ন দেশে কর্মসংস্থানের অভাব, প্রাকৃতিক উৎপাদনের তুলনায় জনসংখ্যা বিপুল হওয়া এবং বিশ্বের বহু দেশে অর্থনীতি ভেঙে পড়ায় এই বিপদ দেখা দিয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে বিশ্বের অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে থাকা দেশগুলির অর্থ উপার্জন কমে এবং প্রগতিশীল দেশগুলিতে তারা বিভিন্ন কাজ আউটসোর্স করতে থাকার ফলে প্রথম সারির দেশগুলিতে প্রশাসনিক আধিকারিক, কর্মচারী ও বিভিন্ন সরকারি

প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয়ভার বিপুলভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদের কপালে দুশ্চিন্তার রেখা দেখা দিয়েছে। সাম্প্রতিককালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সরকার নিযুক্ত বহু কর্মচারীকে কর্মচ্যুত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে শোনা গেছে। ইউরোপীয় দেশগুলি ফ্রি ট্রেড চুক্তির দিকে অগ্রসর হচ্ছে, এটিও একটি দ্বিদেশীয় উৎপাদন তত্ত্ব। একটি দেশ দুটির বদলে একটি জিনিস উৎপাদন করবে ও রপ্তানি করবে এবং অন্য দেশ থেকে অন্য একটি জিনিস আমদানি করবে যা কিনা দ্বিতীয় দেশটির প্রতুল্য দ্রব্য। সেখানে বাণিজ্যের ভারসাম্য রক্ষা হবে অর্থাৎ আমদানি রপ্তানির ফলে দুই দেশ তাদের বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় বেশি অপব্যয় করবে না।

বিষয়টি শুরু হয় বেশ আগে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে বহু দেশ স্বাধীন হয়, কিন্তু সেই সময় তারা ছিল গরিব দেশ বা তৃতীয় বিশ্বের দেশ। সেসময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় দেশগুলি এই নতুন দেশগুলিতে দ্রব্য রপ্তানি করে প্রচুর মুনাফা অর্জন করতে থাকে। সস্তা উৎপাদনের স্বার্থে বহু আন্তর্জাতিক সংস্থা এই তৃতীয় বিশ্বের দেশে বিনিয়োগ করে। তাদের উৎপাদন কায়দা শিখে, নব্বই দশক নাগাদ বহু দেশীয় বস্তু তৈরি শুরু হতে থাকে। তখন মার্কিনি-ইউরোপীয়রা দেখেন প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাচ্ছে লাভ কম হচ্ছে, সে কারণে তারা 'দ্য জেনারেল এগ্রিমেন্ট অন টারিফস্ অ্যান্ড ট্রেড' বা 'গ্যাট'- নামক এক চুক্তিপত্র তৈরি করে। ১৯৯৪ সালে ভারত-সহ ১২৮টি দেশ তাতে স্বাক্ষর করে। তৈরি হয় ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন। এই চুক্তি অনুযায়ী এই দেশগুলি একে অপরের দেশে বাণিজ্য করতে পারবে। পশ্চিমি দেশগুলি ভেবেছিল তাতে তাদের ব্যবসা বাড়বে। তদানীন্তন দুর্বল সরকারের দরুন ভারত এই চুক্তিতে ব্যাপকভাবে লাভবান না হলেও চীন তার মিলিটারি কমিউনিজম দিয়ে সস্তার উৎপাদন করিয়ে বিশ্ববাজার থেকে প্রভূত লাভবান হয়।

বিগত ১১ বছরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় নীতিতে নানা পরিবর্তন আসায় এই চুক্তিতে লাভবান হয়েছে ভারতও। এছাড়াও রাশিয়া, ব্রাজিল ও দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দেশ ও ওপেক দেশগুলি বাণিজ্যিকভাবে লাভবান হয়। ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকার একত্রীকরণের ফলে ২০০৯ সালে আত্মপ্রকাশ করে 'ব্রিকস' দেশগোষ্ঠী। পাশ্চাত্য দেশগুলি সেভাবে লাভের মুখ দেখতে না পাওয়ায় তারা রাজনৈতিক ভাবে সেই বিষয়টির মোকাবিলা করতে থাকে। তারা অর্থ ঢেলে বিভিন্ন দেশে 'রেজিম চেঞ্জ' বা সরকার ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করতে থাকে, যাতে পুতুল সরকার বসিয়ে সেই দেশগুলিকে 'ব্রিকস' দেশগুলির পণ্য কেনা থেকে বিরত রাখতে পারে। তার পালটা জবাবে চীন 'বেল্ট অ্যান্ড রোড প্রোজেক্ট' দিয়ে ছোটো দেশগুলিকে কবজা করতে থাকে। তার উপর পাশ্চাত্য দেশগুলিতে অনলাইন সেল বেড়ে গিয়ে প্রোডাকশন লাইনে এক সমস্যার সৃষ্টি হয়। প্রোডাকশন হাউসের থেকে ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল হাউসগুলির হাতে আসতে থাকে অধিক পরিমাণ অর্থ। যেমন— ওয়ালমার্ট বা অ্যামাজন ইত্যাদি কোম্পানিগুলো সারা বিশ্বের পণ্য ও নানা জিনিসপত্র জড়ো করে বেচতে থাকে। এমনিতে আমরা জানি মা লক্ষ্মী চঞ্চলা, তার উপর সরকার ফেলার অপারেশন বা ধর্মান্তরণে মদত দেওয়ার ক্ষেত্রে মার্কিন USAID বা মার্কিন আগ্রাসন রুখতে চীনা 'বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ'-এর মতো প্রকল্পের মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে অর্থের দুর্ব্যবহার ঘটতে থাকলে তো লক্ষ্মীদেবী রুষ্ট হবেন। লেখক আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁর এক গল্পে লিখেছেন, ছেলে ব্ল্যাকমানি বলাতে তার অবাঙ্গালি বাবা তাকে বলছেন, 'বেটা লক্ষ্মীকে কালা বোলো না, তাকে আন-অ্যাকাউন্টেড বলো'। যাই হোক, অর্থ অপচয়ের কারণেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় দেশগুলি ও চীনের হাতে অর্থ অপ্রতুল হতে থাকে।

মার্কিনি ডেমোক্র্যাট নেতা বারাক ওবামা ২০০৭-০৮ নাগাদ চীনের উহান বায়ো ল্যাবরেটরিকে অর্থ প্রদান করে চীন সরকারের সঙ্গে 'ডিপপুলেশন' বা বিশ্বব্যাপী মানুষের সংখ্যাহ্রাসের এক ছক কষলেন। তার ফলে উহান ল্যাব ২০২০ সালে করোনা নামক এক বিশ্বব্যাপী মারণ ভাইরাস তৈরি করে বসলো। ছড়িয়ে পড়লো কোভিড মহামারী। মহাবীর শ্রীহনুমানের কৃপাতে মানবজাতির সংকটমোচন হয়েছে বটে। বের হয়েছে সেই ভাইরাসের প্রতিষেধক। মা ষষ্ঠীর কৃপায় বিশ্ববাসী তাদের বংশবৃদ্ধি করে চলেছে।

এসমস্ত সংঘাতের মাঝে পড়ে অর্থনৈতিক অবস্থা হয়েছে বেহাল। মহামারী ছাড়াও সন্ত্রাসবাদ, যুদ্ধ পরিস্থিতি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কঠিন আঘাত হানতে শুরু করেছে। ইজরায়েল-হামাস এবং রাশিয়া-ইউক্রেনের যুদ্ধে বিপুল ব্যয় এবং মার্কিন টারিফ (শুল্ক) বৃদ্ধির কারণে চীন থেকে বড়ো ব্যবসায়ীদের সরে আসা, বিশ্বজুড়ে আর্থিক ক্ষেত্রে এক অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করেছে। অর্থলগ্নিকারীরাও অনিশ্চয়তার অন্ধকারে দাঁড়িয়ে তাঁদের লগ্নির ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তায় পড়েছেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট দ্রুততার সঙ্গে ট্যাক্স রিফর্ম বা শুল্কনীতি পরিবর্তন করাতে আমেরিকা-চীন বাণিজ্য যুদ্ধের এক নতুন আশঙ্কা দানা বাঁধছে। বিশেষজ্ঞদের মতে এই পরিবর্তনগুলির ফলে মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা রয়েছে, যার থেকে উত্তরণ না ঘটলে আর্থিক মন্দা অবশ্যম্ভাবী। তাতে আগামীদিনে অর্থসংকট আরও ঘনীভূত হবে, ২০২৭ ও ২০২৮ সালে বিশ্ব জুড়ে তার চরম প্রভাব পড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এর ফলস্বরূপ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের অশনি সংকেত নিয়েও বিশেষজ্ঞদের কপালে চিন্তার রেখা ফুটে উঠেছে। □

শোক সংবাদ

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপন শাখার প্রবীণ স্বয়ংসেবক ভূষণ চন্দ্র বসাক সম্প্রতি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। তাঁর আন্তরিক প্রয়াসে তপন থানার বিভিন্ন গ্রামে সঙ্ঘের শাখা শুরু হয়। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিন্দু মিলন মন্দির কমিটির তিনি সম্পাদক ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি স্থানীয় কড়ই চেঁচড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন।

* * *

আসানসোল জেলার বারাবনি খণ্ডের প্রবীণ স্বয়ংসেবক ফটিক চন্দ্র দাস গত ২১ এপ্রিল পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। তিনি দীর্ঘদিন খণ্ড কার্যবাহ এবং পরে খণ্ড সেবা প্রমুখের দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর প্রচেষ্টায় বারাবনি খণ্ডে সঙ্ঘে শাখা প্রসার লাভ করে।

ভাতা, ভাণ্ডার না পাবার ব্ল্যাকমেলের ভয় আর মানুষ পাচ্ছেন না

বিশ্বপ্রিয় দাস

২০২৬ সালের নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে জনগণের মন বোঝার একটা মরিয়া চেষ্টা শুরু করেছে রাজ্যের শাসক দলের সুপ্রিমো ও সেকেন্ড ইন কম্যান্ড। সুপ্রিমো ইতিমধ্যেই বুঝে গেছেন, এবারের লড়াই অত সুবিধের ও সহজ হবে না। কেননা সাধারণ মানুষ তাদের থেকে অনেকটাই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। রাজ্যের শাসক দলের বাহুবলীদের ক্ষমতা ও দুবৃত্তদের কাজে লাগিয়ে বৈতরণী পার হবার যে কৌশল, সেই কৌশল এবার প্রবল প্রতিরোধের মুখে পড়বেই, সে ধারণাও জনমনে পরিষ্কার। এদিকে সাধারণ মানুষকে নানা ভাতা নিয়ে যে ব্ল্যাকমেলের রাজনীতি, সেটা যে আর ফলপ্রসূ হবে না, সেটাও বুঝে গেছে শাসকদল। এর পিছনে কারণ আর কিছুই নয়, রাজ্যের শাসকদল ভাতা হিসেবে যে অর্থ সাধারণ মানুষকে দেয় সেটি সরকারিভাবে স্বীকৃত ও বাজেটে দেখানো হয়। ফলে এই ভাতা বন্ধ করার কোনো ক্ষমতা নেই কারুর। পরবর্তী সময়ে ক্যাবিনেট পর্যায়ে আলাদা সংশোধনী এনে তবেই কিছু করা যাবে। বন্ধ করা যাবে না। এদিকে যে ভাতা বা প্রকল্পগুলি চালু হয়েছে, সেগুলির অর্থের জোগান সরকারি কোষাগার থেকে আসে, কোনো রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তিগত পিতৃ সম্পত্তি থেকে দেওয়া হয় না। ফলে ওই ব্ল্যাকমেলের রাজনীতি যে আর কাজে আসবে না, সেটাও বুঝেছে রাজ্যের শাসক দল। বিরোধী দল ইতিমধ্যেই জানিয়েছে, ওই সব প্রকল্পে অর্থের মূল্যমান বাড়বে। বন্ধ হবে না। ফলে দাবার চাল যে কিস্তিমাতের দিকে এগোচ্ছে, সেটা শাসক দলের ছোটো থেকে বড়ো নেতারাও টের পাচ্ছেন। আর আবাসন থেকে ত্রাণ, রেশন থেকে চাকরি কেলেঙ্কারি। সব তো রয়েইছে।

দেখা যাক জনগণকে কীভাবে মাপার চেষ্টা চালাচ্ছে রাজ্যের শাসক দল? প্রথমেই তাঁরা একটি ধুয়া তুলেছে ভুতুড়ে ভোটারের। এই সুযোগে তাঁরা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছচ্ছেন। আর কথা বলে জল মাপার চেষ্টা চালাচ্ছে। এটাকে ভোটের একটা সাধারণ কৌশল হিসেবে প্রাথমিক ভাবে মনে করা হয়। শাসক দলের কর্মী থেকে জনপ্রতিনিধি সবাই দুয়ারে দুয়ারে যাচ্ছে। কথা বলছে। আর বুঝে যাচ্ছে কে পক্ষে, আর কে বিপক্ষে। অন্যদিকে শাসক দলের কর্মীদের কথায়, সাধারণ মানুষ খুব একটা ভালোভাবে নিচ্ছে না তাদের। একটা বড়ো শতাংশ যে এই মুহূর্তে শাসক দলের সমস্ত কাজ ও কীর্তিকলাপ বেশ বাঁকা চোখে দেখছে, সেটাও পরিষ্কার। কলকাতায় ও জেলায় যে সব শাসক দলের কর্মী কাজ করছেন, তাঁদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, যে 'রেসপন্স' কেমন? তাঁদের কথার ভিত্তিতে যদি শতাংশের হিসেব ধরা হয়, ৪০ ভাগের সমর্থন এই সময়ে শাসক দলের পক্ষে নেই। সবাই একটা পরিবর্তন চাইছেন। মানুষের কাছে পৌঁছানোর, 'দুয়ারে সরকার' বা সেবাশ্রয়ের মত নানা কৌশল খুব একটা যে কাজে আসছে না, সেটাও বুঝেছেন শাসক দলের নেতারা।

ধরা যাক ডায়মন্ড হারবার, সেকেন্ড ইন কম্যান্ডের কেন্দ্র। সেখানে জল মাপার জন্য তিনি রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সামান্তরাল একটা ব্যবস্থা শুরু করেছেন। তাঁর আইটি টিম ফলাও করে তাঁর প্রচার করছে। আদতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে অপমান করা হচ্ছে, সেটা কি সুপ্রিমো বুঝছেন, না বুঝতে চাইছেন না? নাকি চোখ বন্ধ করে রয়েছেন? প্রশ্ন উঠতেই পারে। এই সেবাশ্রয় এর নামে যে মেডিকেল ক্যাম্প হচ্ছে, সেগুলি আগেও হতো কোনো ক্লাব বা সংগঠনের সহযোগিতায়। এখানে সেটাই রাজনৈতিক কর্মসূচি। আর খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে কিছু হাতে গোনা টেস্ট ছাড়া খুব একটা যে সুফল পাচ্ছেন ক্যাম্পে যাওয়া মানুষজন, তা নয়। এখানে তার দলের কর্মীরা নিজেদেরকে প্রমাণ করার জন্য ক্যাম্পে মানুষকে নানাভাবে ব্ল্যাকমেল করে নিয়ে আসছে। যেমন ভাতা বন্ধ হয়ে যাবার, আবাসনের টাকা না পাবার, পঞ্চায়েতের বা পুরসভার কাছে কোনো সহযোগিতা না পাবার মতো কথা বলার পাশাপাশি ভয়ও দেখানো হচ্ছে। আর এভাবেই মানুষের মনোভাব বোঝার চেষ্টা করে চলেছেন সুপ্রিমো। এবার গোটা ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রের জন্য কি দাওয়াই হবে, সেটা নির্ধারিত হবে।

তাঁর কারণ ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রের যে কয়টি বিধানসভা কেন্দ্র রয়েছে, সেই বিধায়কদের মধ্যে হয়তো অনেকেই এবার টিকিট পাবেন না। ফলে বিদ্রোহের একটা আগুন ধিকি ধিকি জ্বলতে শুরু করেছে বলে শাসক দলের একটি সূত্র মারফত জানা গেছে। ওই সূত্রটি আরও জানিয়েছেন যে এবারে অনেক প্রভাবশালী নেতা টিকিটের দাবিদার। তাঁরা অনেকেই সেকেন্ড ইন কম্যান্ডের কাছের লোক, এদের সংখ্যাটাও সাতের কয়েকগুণ। বেশ কিছু জেতা ক্যান্ডিডেট আছেন, তাঁদের গ্রহণ যোগ্যতা থাকলেও তাঁরা হয়তো এবারে তালিকায় নাও থাকতে পারেন। যদিও আরেকটি বিশ্বস্ত সূত্র জানাচ্ছে, গোটা দক্ষিণ ২৪ পরগনার টিকিট দেওয়ার ক্ষেত্রে কঠিন সমস্যার মুখোমুখি হবে শাসক দল। সুপ্রিমোর সঙ্গে মতের মিলের ক্ষেত্রে কে জেতে আর কে হারে, সেটার দিকে তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল। অন্যদিকে রাজনৈতিক মহলের মতে, নির্বাচনে যে বাহুবলী সংস্কৃতি রাজ্যের শাসক দল চালু করেছে, সেই বিষয়টিকে রুখতে না পারলে কারোর পক্ষেই জেতা সম্ভব নয়। প্রত্যন্ত গ্রামে ভোট লুটের ঘটনাকে থামাতে গেলে একেবারে নিরাপত্তার কঠিন বর্মে ঢেকে দিতে হবে নির্বাচন ক্ষেত্রকে। দুষ্কৃতীদের থামানোর জন্য এখন থেকে কেন্দ্রীয় ভাবে তালিকা তৈরি করে হস্তক্ষেপ করতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারকে। তা না হলে বিরোধীদের সব চেষ্টা বিফলে যাবে। □

গল্পকথায় ডাক্তারজী

(১৬)

বাধা-না আশীর্বাদ

কথায় আছে ভাগ্য যায় সঙ্গে সঙ্গে। কেশবের ভাগ্যে যেন চিরন্তন বাধা, দৌড় প্রতিযোগী হিসেবে বিধাতাপুরুষ নাম লিখে দিয়েছিলেন। অজানা অচেনা বিশাল শহর কলকাতা; সঙ্গে ছিল শুধু ডাঃ মুঞ্জের একটি পরিচয়পত্র। একটু আস্তানার সন্ধানে খুঁজে খুঁজে কেশব শেষে হাজির হলেন 'মহারাষ্ট্র লজ'-এ, বর্তমান বউবাজার স্ট্রিটে। জায়গা নেই কিন্তু ডাঃ মুঞ্জের সুপারিশে যিনি এসেছেন তাকে না করাও কঠিন, তাই কোনোমতে আপাতত কয়েক দিনের জন্য ঠাঁই করে দেওয়া হয়েছিল 'শান্তিনিকেতন লজে'। 'মহারাষ্ট্র লজ'-এর সম্পাদক কেশবরাওকে সেখানে পাঠালেন। দেশসেবক দাদাসাহেব খাপার্ডের পুত্র আন্না সাহেব এখানে ছাত্র হিসেবে ছিলেন। কেশব এখানে পৌঁছে দেখলো সেখানেও জায়গা নেই। সমস্যা, বাধা কেশবের যেন ছায়া সঙ্গী। আন্না সাহেব ছাত্রদের একটু জায়গা করে দেবার জন্য বললে কেউ রাজি হলো না।

একটা মানসম্মানের ব্যাপার দাঁড়িয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত আন্না সাহেব নিজের ও বন্ধু শঙ্কররাও নাইকের দুই তক্তপোষের মাঝে একটু জায়গা করে দিয়েছিলেন। মাটিতেই কেশব মাদুর পেতে শুতো। সদাহাস্যময় কেশবের মুখে কোনো অভিযোগ কোনো দিন কেউ শোনেনি। পুরোনো আমলের ঘরগুলোর জানালা থাকত মেঝে পর্যন্ত, ওখান থেকে কেশব একটু হাওয়া পেত। সে জানালা খোলা রাখতো, নাইকের স্বভাব ছিল জানালা বন্ধ রাখা। এই নিয়ে খুনসুটি, ঝগড়া বেশ হতো। কিন্তু হলে কী হবে, দুজনেই ছিল পরম দেশভক্ত আর দেশভক্তদের বন্ধু তৈরির আলাদা একটা গুণ থাকে, কেশবের তো তা ছোটোবেলা থেকেই ছিল। কলেজে তাই নানা প্রদেশের ছাত্রদের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব ঘটল। এমনই পঞ্জাবি ছাত্র বন্ধুদের একটা মেস ছিল নেবুতলা লেনে। সেখানে নিরঞ্জন সিংহ, শিব দত্তজী পরাশরের সঙ্গে তার খুব ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। মাঝে মাঝে কেশব ওখানে আসতো, সবার সঙ্গে নানান মজা করতো, হাসি গল্পে সময় কাটাতো। সবার কাছে কেশব ছিল আকর্ষণের কেন্দ্র। ওখানে একটি ঘটনা ঘটে।

যে কোনো কারণেই হোক মেসের পাড়ার ওই গলির লোকেরা ওই ছাত্রদের খুব ভালো চোখে দেখতো না। তাই তারা যাতে চলে যায় সে জন্য রাতে নিয়মিত কেউ ওই মেসবাড়ির উপরে ঢিল ছুঁড়তো। এই উৎপাত বেশ কয়েকদিন ধরেই চলছিল। কেশবও মাঝে মাঝে এসে সে কথা শুনেছে। সেদিন সন্ধ্যায় এলে দেখা গেল আবার ইটের টুকরো, পাথর চালে এসে পড়ছে। বোঝা যাচ্ছিল না কোন দিক থেকে ঢিল আসছে। কেশবের মধ্যে দাদার সেই কথা— 'দুষ্টু ছেলেকে দেখলে শায়েস্তা না করে ফিরবে না' যেন সজীব হয়ে উঠলো। সে হঠাৎ নিরঞ্জনের হাত ধরে বললো চল নীচে, আর দেরি করা যাবে না। রাস্তার পাশেই মেস, নীচে যেতে দেখল দুটো ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। মুহূর্তে তাদের ধরে কেশব উত্তম মধ্যম দেওয়া শুরু করল। এবার ছেলে দুটি কাঁদতে কাঁদতে জিজ্ঞেস করল মারছেন কেন, কারণ কী? কেশব গর্জন করে উত্তর দিল— 'আমরাও তো জানি না বাড়িতে ঢিল পড়ছে তার কারণ কী! ঢিল বন্ধ হবে— মারাও বন্ধ হবে'। তার রুদ্র রূপ দেখে ছেলে দুটি দৌড়ে পালালো। বোঝা যাচ্ছিল কেশব রাওয়ের গর্জন অনেক দূর পৌঁছে গিয়েছিল। তারপর থেকে মেসের ওপরে আর ঢিল পড়েনি।

সংকলন : বিমলকৃষ্ণ দাস